Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

“ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব”

তত্ত্বাবধায়নে ঃ

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সায়েমা সামাদ
আইডি নং: ২১৫০০১২৩০

তারিখ: ০২ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through your knowledge to Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

“ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব”

এই রিপোর্ট টি ইসলামি অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নে ঃ

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা-আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সায়েমা সামাদ
আইডি নং: ২১৫০০১২৩০

Through knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সায়েমা সামাদ, আইডিঃ ২১৫০০১২৩০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

.....

তত্ত্বাবধায়নে ঃ

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

(স্বাক্ষর)

.....

এক্সটারনালঃ

নাম
ডিপার্টমেন্ট
প্রতিষ্ঠান

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব" শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah- IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

সায়েমা সামাদ

তারিখঃ
০২ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

(স্বাক্ষর)
(সায়েমা সামাদ)
আইডিঃ ২১৫০০১২৩০
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	লেখকের কলাম	০৫
২.	ভূমিকা	০৭
৩.	পরিবার কাকে বলে	০৮
৪.	বর্তমানে পারিবারিক বন্ধনের বাস্তব চিত্র	১২
৫.	পারিবারিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ	১৩
৬.	পারিবারিক বন্ধন ও সচেতনতা	১৭
৭.	পরিবারে মায়ের ভূমিকা	১৯
৮.	সন্তান পালনে পারিবারিক বন্ধন কেন গুরুত্বপূর্ণ	২৩
৯.	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজ ও পরিবার	২৫
১০.	পরিবারের উপর পরিবর্তনশীল সমাজের প্রভাব	৩২
১১.	পশ্চিমা সমাজের অবস্থা	৩৯
১২.	পাশ্চাত্যে জীবন ব্যবস্থা	৪০
১৩.	পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের করুণ অবস্থা	৪১
১৪.	পশ্চিমা বিশ্বে মায়েদের অবস্থা	৪২
১৫.	ইউরোপে নারীর প্রতি সহীংসতা	৪৫
১৬.	মুসলিম নারী বনাম পাশ্চাত্য নারী	৪৬
১৭.	ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব	৪৭
১৮.	ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ	৪৯
১৯.	ইসলামের পারিবারিক জীবন চারটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত	৫৯
২০.	ইসলামে পারিবারিক সম্পর্ক	৬০
২১.	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পারবিারিক জীবন	৬২
২২.	ইসলামে পারিবারিক বিকাশ	৬৬
২৩.	পরিবার ও সমাজ গঠনে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা	৬৭
২৪.	ইসলামে পারিবারিক বন্ধন সুদূর করার তাগিদ	৬৯
২৫.	পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে ইসলামের নির্দেশনা	৭০
২৬.	পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে ইসলামের পাঁচটি নির্দেশনা	৭১
২৭.	পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা রোধে ইসলামের নির্দেশনা	৭২
২৮.	আদর্শ মুসলিম পরিবারের ১০ বৈশিষ্ট্য	৭৫
২৯.	উপসংহার	৭৯
৩০.	তথ্যসূত্র	৮১

লেখকের কলাম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমকে থিসিস লেখা এবংসময়ের মধ্যে পরিসমাপ্ত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যিনি ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীতা ও গুরুত্ব" থিসিসের এর কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

আমি সায়েসা সমাদ। ২১৫ বাচের ত্বলিবুল। আমার আইডি ২১৫০০১২৩০। এই শিরোনামে থিসিস লেখার সময় আমার পিছনে ফেলে আসা কিছু স্মৃতি বারবার মনে পড়ছিল। হাসবেন্ডের পিএইচভি এর সুবাদে তিন বছর জাপানে থাকার সুযোগ হয়। আমি বাবা ও মেয়ে দ্বারা পরিচালিত এক কোম্পানিতে কিছু দিন চাকরী করি। প্রায় ছয় মাস পর জাপানিজ বাবার ক্যান্সার ধরা পাড়ে। তিনি দিন দিন দুর্বল হতে থাকেন । খাওয়া দাওয়ার রুচি প্রায় হারিয়ে ফেলেন। একদিন দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় জাপানিজ বাবা তাঁর মেসের কাছে এসে খাবার চাইলো। মেয়েটি এসে খাবার চাইলেন। মেয়েটি সোজা উত্তর দিলো তোমাকে খাবার দিলে আমি কি খাব? আমি তোমাকে খাবার দিতে পারবো না। তখন আমার আব্বার কথা মনে পড়ে। উনিও ছিলেন কান্সারের রোগী। বাংলাদেশে থাকার সময় উনি যখন যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন সাথে সাথে তা তৈরী করে উনার সামনে হাজির করেছি। সেই দিন আমি আর কিছু খেতে পারিনি। পরের দিন বাঙ্গলী মেজবান কিছু খাবার তৈরী করে উনাকে খেতে দিয়েছিলাম। কত খুশি হয়ে তা তিনি খেলেন তা বলে বুঝাতে পারবোনা। তারপর জাপানিজ বাবা মারা গেলে অফিসে আমাকে রেখে কালো কোর্ট পরিহিত করে সবাই উনাকে সমাহিত করতে গেল। সমাহিত করে মা, মেয়ে এবং অফিসের সবাই যখন ফিরে এল তখন তারা কোথায় দুপুরের সাবার খাবে তা নিয়ে শোরগোল শুরু করে দিল। শোকের বিন্দুমাত্র চিহ্ন আমি তাদেরমধ্যে দেখতে পেলাম না। বুঝতে পারলাম পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব তাদের সমাজে অর্থহীন। আমার আব্বা মারা যাওয়ার পর হাসবেন্ডের পিএইচডি সম্পন্ন হলে আমরা বাংলাদেশে ফিরে আসি। বাংলাদেশে ফিরে এসে আমি আব্বার ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব নিই। কিছু দিনে বুঝতে পারি "শরষে ক্ষেতে ভুত"। আমার অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়। মানুষকে বিশ্বাস করে শরীয়ত জ্ঞান পরিপূর্ণ না থাকায় বুঝে না বুঝে আমি অনেক ঋণের মধ্যে ডুবে যাই। সেদিন বুঝেছি পারিবারকি বন্ধনের ভিত কত মজবুত হয়। সময় অসময়ের বন্ধুরা দূরে সরে যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমার স্বামী, আম্মা এবং শাশুড়ির মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান করে দেন। তারপর কিন্তু হতাশা আমার জবীনকে একটু একটু করে গ্রাস করছিল। সেই সময় আমার মেয়ে জামাই ব্যস্ত থাকার জন্য IOM ভর্তি করিয়ে দেয়।। ভর্তি হওয়ার পর শরীয়ত কোরআন ও হাদিস নিয়ে লেখাপড়া করার ফলে আমি জীবনের সার্থকতা খুজে পাই। এই রাস্তায় যে এত শান্তি এটা এখন ধাপে ধাপে অনুধাবন করছি। আরো অনুধাবন করছি ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের ।

পরিশেষে বলতে চাই কোন মানুষই ভুল ত্রটির উর্ধ্বে নয় বা কোন অংশে ভুল ভ্রান্তি থাকলে সাথে সাথে আমাকে অবগত করার চেষ্ঠা করবেন। আমি সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী। আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ তায়ালা যেন আমার এই থিসিস লেখার জন্য পড়াশোনাকে কবুল করে নেন এবং এই জ্ঞানকে পরবর্তী জীবনে কাজে লাগানোর তৌফিক দান করেন।

ই-মেইলঃ sayema.samad29@gmail.com

ভূমিকা

পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য আল্লাহ রাববুল আলামীন প্রথমে আদম (আ)- কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁর পাজর থেকে জুড়ি হিসেবে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেন। তাঁদের উভয়ের দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে পৃথিবীতে পরিবারের সূচনা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ১)। يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি এক জাতি ও গ্রোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো।" (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৩)। আর এভাবেই মানুষের সামাজিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়। মানুষ সকল যুগ ও কালে কোন না কোনভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীন কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা স্তর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর আদি সংস্থা।

Family and Marriage গ্রন্থে বলা হয়েছে, One of the oldest among human institutions, the family, is also the most resilient. মানব জীবনের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। ব্যক্তি পরিবারের একটা অংশ। সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না, তেমনি পরিবার ছাড়া সমাজও অকল্পনীয়। পরিবার ঠিক হলে ব্যক্তি ঠিক হয়ে যায়। আর ব্যক্তি ঠিক হয়ে গেলে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ঠিক হয়ে যায়। সুখে-সমৃদ্ধিতে গড়ে ওঠে সর্বাঙ্গীন সুন্দর এক সমাজ কাঠামো। এজন্য ইসলাম পারিবারিক জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে এবং কুরআন-সুন্নাগর বিধি-বিধানের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে পরিবার।

পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথমে আদম (আ)- কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁর পাঁজর থেকে জুড়ি হিসেবে হাওয়া (আ)- কে সৃষ্টি করেন।[১] তাঁদের উভয়ের দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে পৃথিবীতে পরিবারের সূচনা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ১)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পাস্পর পরিচিত হতে পার.. ।" (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৩)।

আর এভাবেই মানুষের সামাজিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়। মানুষ সকল যুগ ও কালে কোন না কোনভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীন কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা স্তর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর আদি সংস্থা।

❐ পরিবার কাকে বলে

পরিবার বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি যে, বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক যৌথভাবে বসবাস করার একটি সংগঠন। আবার অনেকে মনে করেন যে, পরিবার যৌন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত এমন একটি নির্দিষ্ট জুটি যা পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করে সন্তান প্রসবের এবং প্রতিপালনের। অতএব স্বামী এবং স্ত্রীর বন্ধন দ্বারাই পরিবারের সৃষ্টি।

পরিবারের ইংরেজি 'Family' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Familia' এবং রোমান শব্দ 'Famulus' থেকে এসেছে। উভয়ের অর্থ হচ্ছে Servant বা সেবক। Roman Law System অনুযায়ী পরিবার বলতে উৎপাদক, ভৃত্য ও অন্যান্য সদস্য নিয়ে গঠিত এমন একটি গোষ্ঠী যারা অভিন্ন বংশ বা বিবাহের দিক থেকে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী **এম. এফ, নিমকফ (M. F. Nimkoff)** তাঁর 'Marriage and the Family' গ্রন্থে পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, "Family is a more or less durable association of husband and wife with or without children or of a man or woman alone or with children." অর্থাৎ, পরিবার মোটামুটিভাবে স্বামী এবং স্ত্রী দ্বারা সৃষ্ট একটি সংঘ, যেখানে সন্তান- সপ্ততি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।

ম্যাকাইভার ও পেজ (Maclver and Page) তাঁদের 'Society : An Introductory Analysis' শীর্ষক গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করেন, "Family is a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. অর্থাৎ, সুনির্দিষ্ট যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং সন্তান- সন্ততি জন্মদান ও তাদের লালন- পালনের জন্য যথার্থ ও স্থায়ী গোষ্ঠীকে পরিবার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

এলিয়ট ও মেরিল (Eliot and Merrill)

পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

"Family is the biological social unit composed of husband, wife and children." অর্থাৎ, পরিবার হলো স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তান- সন্ততি দ্বারা গঠিত একটি জৈবিক সামাজিক একক।

ই.ডব্লিউ. বারজেস ও এইচ. জে. লক (E. W. Burgess and H. J. Locke) তাঁদের 'The Family' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "Family is a group of persons united by the ties of marriage, blood or adoption; constitution a single household interacting with each other in their respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister creating a common culture." অর্থাৎ, পরিবার হলো ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যরা বিবাহ বন্ধন, বক্তের সম্পর্ক বা দত্তকসূত্রে সংঘবদ্ধ হয় এবং পারস্পরিক ক্রিয়া ও আন্তঃযোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে একত্রে বসবাস করে। ভক্তিপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রী, মাতাপিতা, পুত্র-কন্যা, ভাইবোন মিলেমিশে অভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টি করে।

❐ **পরিবারের বৈশিষ্ট্য**

পরিবারের মাঝে আমরা কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই; যেমন- ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের গ্রন্থ 'Society তে পরিবারের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। এবং তাঁদের মতে এ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সদা বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেন। এ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১.যুগল সম্পর্ক,

২. বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি,

৩. বংশানুক্রমে পরিবারের বিকাশ লাভ,

৪. সাধারণ বাসস্থান বা একই গৃহে অবস্থান ও

৫. একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে গোষ্ঠী পরিচালনা।

তাঁদের মতে, এ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া পরিবারের কথা চিন্তা করা যায় না। তবে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য যোগ হতে পারে। যেমন-

১.পরিবারের সদস্যদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে,

২. প্রত্যেক পরিবারের একটি নিজস্ব নাম বা পরিচিতি আছে,

৩. সামাজিক অনুশাসন মেনে চলতে হয়,

৪.পরিবার সামাজিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় অংশ,

৫. এটি বিশ্বজনীন,

৬. সহযোগিতার নীতি বিদ্যমান।

সুতরাং এখন দেখা যাচ্ছে যে, বিবাহ পরিবার গড়ে উঠার প্রধান সহায়ক; যেমন- সমাজবিজ্ঞানীগণ পুরুষ ও স্ত্রী নানারূপ ছুটি ও জাতি সম্পর্কের উপর নির্ভর করে পরিবারকে বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন নামকরণ করেছেন।

❐ পরিবারের কার্যাবলী

পরিবার সমাজজীবনে এমন একটি স্থান অধিকার করে আছে যেখানে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যু অবধি সেখানেই জীবন অতিবাহিত করে। এজন্য বিভিন্ন প্রকারে বহুবিধ কার্যসম্পাদানের মাধ্যমে পরিবার সমাজজীবনে বিদ্যমান।

আমরা দেখতে পাই যে, সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজকে জানার জন্য পরিবারের কার্যপ্রণালিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তুলে ধরেছেন; যেমন- সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, পরিবারের কার্যাবলী গুলো নিম্মোক্ত ভাগে বিভক্ত করা যায়:

১.জৈবিক বা জন্মদানমূলক কার্যাবলী (Biological functions)

২. শিক্ষামূলক কার্যাবলী (Educational function)

৩. অর্থনৈতিক কার্যাবলী (Economic functions)

৪. রাজনৈতিক কার্যাবলী (Political functions)

৫. মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী (Psychological functions)

৬. আমোদ-প্রমোদ কার্যাবলী (Recreational functions)

৭. সামাজিকীকরণ কার্যাবলী (Socialization function) এবং

৮. ধর্মীয় কার্যাবলী (Religious functions)

❐ পরিবারের সাধারণ ধারণা

সাধারণভাবে পরিবার বলতে বোঝায় কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টিকে যারা একত্রে বসবাস করে এবং যাদের মধ্যে প্রত্যাক্ষ ও আন্তরিক সম্পর্ক বিরাজ করে।

বিবাহ, রক্ত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ একটি সামাজিক গোষ্ঠী (Social Group) হলো পরিবার। পরিবার হলো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক ও মুখোমুখি সম্পর্কযুক্ত (Face to face relationship) একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যেখানে পরিবারের বাইরের কোনো ব্যক্তির স্থান নেই।

❐ পরিবারের গুরুত্ব (Importance of Family)

পরিবার (Family) হলো একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social Institution) এবং সমাজ কাঠামোর (Social Structure) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌল অঙ্গ সংগঠন। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, পরিবার হচ্ছে মানব সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন, আদি, মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান (Institution)। তাই পরিবারকে সমাজের মুখ্য বা প্রাথমিক গোষ্ঠী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। পরিবার হলো সমাজের কেন্দ্রবিন্দু।

মানব সমাজের উষালগ্ন থেকেই পরিবারের অস্তিত্ব দৃশ্যমান হয়েছে। পরিবারবিহীন সমাজের চিত্র কল্পনা করা যায় না। আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব সমাজেই পরিবার দৃষ্ট হয়েছে। হয়তো এর বিবর্তন ঘটেছে, রূপ বদলেছে কিন্তু সমাজে পরিবারের স্থায়ী আসন কখনো বিলুপ্ত হয়নি; পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ফুরায়নি। এর অন্যতম কারণ হলো মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষ একাকী থাকতে পারে না। স্বাভাবতই মানুষ সঙ্গপ্রিয়। একে অন্যের পারস্পরিক সহযোগিতায় একত্রে মিলেমিশে বাস করতে চায় যা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট। এই সহজাত প্রবৃত্তিই মানুষকে পরিবার গঠনে ধাবিত করেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষ পরিবারের আবহেই অবস্থান করে।

পরিবারের মধ্যেই একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, লালিত-পালিত হয়, বেড়ে ওঠে, শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, কর্ম করে এবং এক সময় পরিবারের মধ্যেই সে মৃত্যুবরণ করে। এমন কি মৃত্যুর পর তার শেষ কৃত্যের অনুষ্ঠান পর্যন্ত পরিবারের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। তাই বলা যায়, পরিবার একটি স্থায়ী ও সর্বজনীন (Universal) সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

➢ শেষকথা

পরিবার প্রায়শ সন্তানসহ বা সন্তানবিহীন এক বা একাধিক দম্পতির ছোটো সংসার নিয়ে গঠিত। এর আর্থিক ভিত্তি রয়েছে। এই ভিত্তিকে কেন্দ্র করে আত্মীয়, সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং ঐক্যবদ্ধ কাজের মাধ্যমে তা রূপায়িত হয়। পরিবারের বিকাশে সন্ধানযোগ্য বংশগত সম্পর্ক সাধারণত জ্ঞাতি সম্পর্কের চেয়ে অগ্রাধিকার পায়। এই শৃঙ্খলার মধ্যে সদস্যরা সমাজের আর্থিক ও সামাজিক উপ-প্রথাগুলি গড়ে তোলে।

❐ বর্তমানে পারিবারিক বন্ধনের বাস্তব চিত্রঃ

মানব সভ্যতার মৌলিক ও সৌহার্দ্য-ভালবাসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান পরিবারে এখন ব্যাপক ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণেই সামাজিক অস্থিরতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রথমে একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙ্গে একক পরিবার প্রথা চালু হতে থাকে।

তখন স্বামী-স্ত্রী মা-বাবাকে ছেড়ে আলাদা বাড়িতে থাকতে শুরু করল। এভাবে ফ্লাটভিত্তিক পরিবারের বিকাশ ঘটল। হয়তো স্বামী চাকরি করছে, স্ত্রী বাসায় থাকছে; স্বামী স্ত্রীকে ঠিকভাবে সময় দিতে পারছে না অথবা স্বামীকে যথাযথভাবে স্ত্রী সময় দিতে পারছে না। এর সুযোগে পরিবারে ঢুকে পড়ছে পরকীয়ার মতো জঘন্য অপরাধ।

আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রযুক্তির কারণেও পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হচ্ছে। যেমর মোবাইল, ফেসবুক ও ইউটিউব নিয়ে মানুষ খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ায় পরিবারের সদস্যরা একে অন্যকে যে পরিমাণ সময় দেওয়া উচিত তা দিতে পারছে না। এর সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের কারণে অবিশ্বাস, হতাশা, লোভ ও মানসিক বিষন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন পরিবার হয়ে উঠছে রণক্ষেত্র। পরিবারের অন্যান্য সদস্য বিশেষ করে বাড়ির বরকত পিতামাতার জায়গা হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে এবং পরিবারের সৌন্দর্য শিশুদের চাইল্ড কেয়ারে। ফলে পারিবারিক পবিত্র বন্ধন অগ্নিপুরীতে রুপান্তরিত হচ্ছে।

❐ পারিবারিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী বিষযসমূহ

১.শারঈ জ্ঞানের অভাবঃ মহান আল্লাহ বলেছেন, জ্ঞান অর্জন কর, যাতে করে তোমাদের বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পার। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় থাকলে নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা

তৈরী হয় এবং ধন-সম্পদ ও আয়ুকাল বৃদ্ধি পায়'। [1] জগতশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী তাই অধ্যায় রচনা করেছেন- بَابُ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ 'কথা ও কর্মের পূর্বে জ্ঞান'। কেননা দুনিয়াতে সমস্ত অঘটনের পেছনে কিন্তু প্রথমত অজ্ঞতাই দায়ী।

২. পিতা-মাতার মর্যদার অবমূল্যায়নঃ পারিবারিক বন্ধনের কেন্দ্রবিন্দু হ'ল পিতা-মাতা। যাদের মাধ্যমে একজন মানুষ পৃথিবী নামক এই ছোট্ট গ্রহে আগমন করে। ফলে পৃথিবীতে একজন সন্তানের নিকট পিতা-মাতা সর্বোত্তম আচরণ পাবে এটাই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ বলেন, মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শত্রু হ'ল তার অজ্ঞতা-মূর্খতা। অজ্ঞতাকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়। ইসলাম অহীভিত্তিক জ্ঞান সম্বলিত এক অনন্য জীবন ব্যবস্থার নাম, যা মানুষকে সার্বিক জীবনে জ্ঞান নির্ভর সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে এবং যার মাধ্যমে মানবতার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الْأَلْبَابِ 'তুমি বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বস্তুতঃ জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ কনে থাকে' (যুমার ৩৯/৯)। অতএব পরিবার ও পারিবারিক জ্ঞানের অভাবে পারিবারিক মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে, পারিবারিক অস্তিরতা ও অশান্তি দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

মহান আল্লাহ বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' (বনী ইসরাঈল ২৩- ২৪/১৭)।

কৃতজ্ঞতার দিক থেকে মহান আল্লাহর পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদয় হওয়ার তাকীদ এসেছে।

পিতা মাতার কথা স্মরণ করিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর' (নাহল ১৬/৭৮)।

৩. সুবিচারের অভাব : বর্তমান সমাজ ও পরিবারে ইনছাফ ও সুবিচারের বড়ই অভাব। সুবিচার না থাকলে একটি সমাজ, একটি দেশ টিকে থাকতে পারে না। ন্যায়পরায়ণতা না থাকলে একটি পরিবার সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে না। ইনছাপ না থাকলে কোথও শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা থাকে না। মহান আল্লাহ মানবজাতির প্রতি সুবিচারের আদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ ও অবাধ্যতা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' (সূরা নাহল ১৬/৯০)। অন্য আয়াতে এসেছে, اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত' (মায়েদাহ ৫/৮)।

৪. পর্দাহীনতা ও অল্পেতুষ্টিহীন জীবনযাপনঃ

পর্দাহীনতার কারণে আধুনিক পরিবারগুলোতে ক্যান্সারের মত পরকীয়া ছড়িয়ে পড়েছে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মিল নেই। ঘরে-বাইরে অশান্তির দাবানল জ্বলছে। স্বামী চাকুরীজীবী বা প্রবাসী, স্ত্রীকে সময় দিতে পারে না অথবা উভয়ে চাকুরীজীবী অথবা স্বামী এবং স্ত্রী নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করেন। ফলে পরস্পরের ব্যস্ততায় দাম্পত্য জীবন ব্যাহত হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার যা একটি আদর্শ পরিবারের জন্য বড়ই হুমকির। মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)- এর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ-إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا 'আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে' (আহযাব ৩৩/৩৩)।

৫. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্কহীনতাঃ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মান-মর্যদার দিকে খেয়াল রাখার পাশাপাশি পারস্পরিক আচরণ বিধি পুরোপুরি মেনে চলা উচিৎ। প্রতিটি মানুষ তার আত্মীয়তা তথা পারিবারিক ভালোবাসার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্বাবধায়ক' (নিসা ৪/১)।

وَالْأَرْحَامَ ‘আরহাম’ শব্দের ব্যাখ্যায় শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)- কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এর দ্বারা পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত সকল আত্মীয়-স্বজনকে বুঝায়।

মহান আল্লাহ বলেন, وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوْا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوْفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا ‘আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পরের অধিক নিকটবর্তী অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণের চাইতে। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ কর তাতে বাধা নেই। আর এটাই মূল কিতাবে (লাওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ আছে’ (আহযাব ৩৩/৬)।

৬. বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহের ঘাটতিঃ ইসলামে বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহের যে পরিসর রচিত হয়েছে তা পারিবারিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতায় এক ঐতিহাসিক দলীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا ‘যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না সে আমার দলভুক্ত নয়’।

ব্যক্তিদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ‘উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-অহংকারীকে’ (নসা ৪/৩৬)।

রাসূল (ছাঃ)- এর ভাষায় পাড়া-প্রতিবেশীও আত্মীয়স্বজনদের অর্ন্তভুক্ত। অতএব তারাও সর্বোত্তম আচরণ পাওয়ার হকদার। অথচ বংশীয় অহমিকা, যিদ, মান-অভিমানের জায়গা থেকে শয়তান পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে একে অপরের মধ্যে চরম শত্রুতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ‘আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম সাথী সে, যে তার সঙ্গী-সাথীর নিকট উত্তম। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম প্রতিবেশী সে, যে তার পড়শীর নিকট উত্তম’। [19]

অথচ ইসলামী পরিবারে দাদা-দাদী, নানা-নানী বড় ভাই-বোন ও নাতি-নাতনী, স্নেহের কচিকাচার মিলনমেলা। যেখানকার পারস্পরিক ভালবাসা ও মমত্ববোধ মহান আল্লাহর অপার দান। সন্তান লালন-বালনে পিতা-মাতার পাশাপাশি দাদা-দাদী, নানা-নানী, বড় ভাই-বোন অজস্র পরিশ্রম করেন।

৭. পারিবারিক অহংবোধঃ

উচ্চ বংশীয়, নিচু বংশীয়, সাদা-কালো, ধনী-গরীব সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের মাধ্যমে একটি পরিবার গঠিত হয়, যা মহান আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

কিন্তু আজকের আধুনিক পরিবারে এগুলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিয়েশাদীর মাধ্যমে এক পরিবারের সদস্য অন্য পরিবারের আপনজন হয়। পরিবারে জাহেলী যুগের আছাবিয়াত বা অন্যায় পক্ষপাতদুষ্টতা, অহংকার, যিদ, রাগ, মান-অভিমান. জাতিগর্ব, বর্ণবাদ, শ্রেণী বিদ্বেষ, জাত্যাভিমান, গোত্র ও দলীয় গোড়ামী মানুষের ভেতর হিংসা ও জিঘাংসার চারা বুনে। শযতান পরস্পরের সম্পর্ক বিননষ্ট করার জন্য জাতিগত বিভেদের ভয়ংকর এক অদৃশ্য প্রাচীর তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। পরিবারের এক সদস্য অন্য সদস্যকে ঘৃণা করে, তুচ্ছ ভাবে, গালমন্দ করে, যা চরম অমানবিক ও অমার্জনীয় অপরাধ। এসবের ফলে চরমভাবে পারিবারিক বন্ধন বিপর্যস্ত হয়।

পৃথিবীতে বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্রহণ করে প্রত্যেকটা মানুষ যুগের পর যুগ বেঁচে থাকতে চায়। চলতে গিয়ে যখন ছন্দপতন হয়, বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। সমাজে আত্মহত্যার প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। শুধু কিশোর-কিশোরী নয়, এই প্রবণতা এখন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তির মধ্যেও প্রবলভাবে দেখা যাচ্ছে। আঁচল ফাউন্ডেশনের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ১৪ হাজার ৪৩৬ টি। অন্যদিকে সেই সময়ের মধ্যে ৮ হাজার ৪৬২ জন প্রাণ হারিয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে। করোনা ভাইরাসে যত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তার থেকে আত্মহত্যায় প্রাণ হারিয়েছে ৭০ শতাংশ বেশি মানুষ। আত্মহত্যার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হিসাবমতে, প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে আনুমানিক ১০ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে।

আত্মহত্যাকে অ্যারোন দেখেছেন এভাবে, 'আত্মহত্যা হলো আত্মহত্যাকারী কতৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ঘটনা, যা মৃত্যু ঘটায়- Suicide is every case of death resultiry directly or indirectly from a positive or negative act performed by the victims himself and which strives to produce this result'। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এটিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মানুষ চলার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় আমরা সেগুলোকে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি। যেমন, পারিবারিক কলাহ, হতাশা, বেকারত্ব, নির্যাতন ইত্যাদি। এসব আর্থসামাজিক

প্রেক্ষাপটগুলো অত্মহত্যার পুশ ফ্যাক্টর হিসেবে চিহ্নিত। আত্মহত্যা প্রতিরোধে পারিবারিক বন্ধ পুল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে। এখন আমরা যদি পুল ফ্যাক্টরকে শক্তিশালী করতে পারে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে পারিবারিক বন্ধনপ অনেকাংশে কার্যকর। এমনকি যাদের পারিবারিক বন্ধন দেশ শক্তিশালী তারা তুলনামূলকভাবে রোগে কম আক্রান্ত হয় (জার্নাল অব ফ্যামিলি সাইকোলজি)। যে ব্যক্তির পারিবারিক বন্ধন শিথিল তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। পুশ ফ্যাক্টরের মতো আর্থসামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে যখন পরিবারের কোন সদস্য হতাশায় নিমজ্জিত তখন এগিয়ে আসতে হবে বাকি সদস্যদের। সেই সময়ে দরকার যথাযথ সচেতনতা এবং কাউন্সেলিং। পারিবারিক বন্ধন ও সচেতনতাই পারে আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা হ্রাস করতে।

পারিবারিক বন্ধন ও সচেতনতা

পৃথিবীতে বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্রহণ করে প্রত্যেকটা মানুষ যুগের পর যুগ বেঁচে থাকতে চায়। চলতে গিয়ে যখন ছন্দপতন হয়, বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। সমাজে আত্মহত্যার প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। শুধু কিশোর-কিশোরী নয়, এই প্রবণতা এখন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তির মধ্যেও প্রবলভাবে দেখা যাচ্ছে। আঁচল ফাউন্ডেশনের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ১৪ হাজার ৪৩৬ টি। অন্যদিকে সেই সময়ের মধ্যে ৮ হাজার ৪৬২ জন প্রাণ হারিয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে। করোনা ভাইরাসে যত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তার থেকে আত্মহত্যায় প্রাণ হারিয়েছে ৭০ শতাংশ বেশি মানুষ। আত্মহত্যার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হিসাবমতে, প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে আনুমানিক ১০ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে।

আত্মহত্যাকে অ্যারোন দেখেছেন এভাবে, 'আত্মহত্যা হলো আত্মহত্যাকারী কতৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ঘটনা, যা মৃত্যু ঘটায়- Suicide is every case of death resultiry directly or indirectly from a positive or negative act performed by the victims himself and which strives to produce this result'। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এটিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মানুষ চলার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় আমরা সেগুলোকে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি। যেমন, পারিবারিক কলাহ, হতাশা, বেকারত্ব, নির্যাতন ইত্যাদি। এসব আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটগুলো অত্মহত্যার পুশ ফ্যাক্টর হিসেবে চিহ্নিত। আত্মহত্যা প্রতিরোধে পারিবারিক বন্ধ পুল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে। এখন আমরা যদি পুল ফ্যাক্টরকে শক্তিশালী করতে পারে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে পারিবারিক বন্ধনপ অনেকাংশে কার্যকর। এমনকি যাদের পারিবারিক বন্ধন দেশ শক্তিশালী তারা তুলনামূলকভাবে রোগে কম আক্রান্ত হয় (জার্নাল অব ফ্যামিলি সাইকোলজি)। যে ব্যক্তির পারিবারিক বন্ধন শিথিল তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। পুশ ফ্যাক্টরের মতো আর্থসামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে যখন পরিবারের কোন সদস্য হতাশায় নিমজ্জিত তখন এগিয়ে আসতে হবে বাকি সদস্যদের। সেই সময়ে দরকার যথাযথ সচেতনতা এবং কাউন্সেলিং। পারিবারিক বন্ধন ও সচেতনতাই পারে আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা হ্রাস করতে।

তথ্যসূত্রঃ লেখক: শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

❐ পরিবারে মায়ের ভূমিকা

বাঙালি সমাজে পিতৃ-প্রধান পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও আধুনিক বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বর্তমান যুগে পরিবারে বাবার পাশাপাশি মায়ের প্রাধান্যও প্রায় সমপর্যায়েই পৌঁছে গেছে। সরকারিভাবেও সন্তানের পরিচয়ে বাবা-মা উভয়কেই প্রাধান্য দেওয়ার বিধান রয়েছে। বর্তমানে জাতীয় পরিচয়পত্রে একজন পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন বাবা-মায়ের নাম উল্লেখ করতে হয় তেমনি একজন নারীকেও বাবা-মায়ের নামই উল্লেখ করতে হয়। প্রচলিত আমাদের পারিবারিক কাঠামোতেই শুধু ব্যাপক পরিবর্তন আসেনি বরং পরিবারে নারীর অধিকার, ক্ষমতা এবং দায়িত্বও অনেক বেড়েছে। পরিবারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সম্পদ

ক্রয়-বিক্রয়, সন্তানের ভবিষ্যতসহ সব বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীও সমান ভূমিকা রাখছে।

'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' অর্থাৎ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর প্রাধান্য, প্রভাব ও ক্ষমতা বাড়লেও বাংলায় প্রচলিত এই সত্যটি এখনো অনেক গুরুত্ব বহন করে। একজন নারী পরিবারে শুধু একজন পুরুষের স্ত্রী নন বরং সন্তানেরও মা। এই আধুনিক সভ্য জগতেও সন্তানের কাছে তার মা সবচেয়ে প্রিয়, পবিত্র ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, স্নেহ, মায়া-মমতা ও ভালোবাসা বজায় রেখে সুখের সংসার গড়ে তোলা এবং পরিবারের সদস্যদের সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রধান দায়িত্ব নারীকেই পালন করতে হয়। এ কারণেই পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সন্তানের ভবিষ্যত অনেকাংশেই মায়ের ওপর নির্ভরশীল।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন দেখা দিলেও পরিবারে নারীর ভূমিকা ও সন্তানের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মায়ের গুরুত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সৎ, আদর্শবান, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে একমাত্র মায়েদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

❐ পরিবারের সাথে সময় কাটানোর স্বাস্থ্য সুবিধা

১.মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতি ঘটায়

যখন আমরা পরিবারের সাথে সময় কাটাই- বিশেষ করে ডিজিটালের বিপরীতে মুখোমুখি যোগাযোগ- এটি হতাশা, উদ্বেগ এবং অন্যান্য মানসিক অসুস্থতার ঘটনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। প্রিয়জনের সাথে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকা জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মধ্য দিয়ে আপনাকে উৎসাহিত করার জন্য একটি শক্তিশালী মানসিক সমর্থন তৈরি করে।

২. বাচ্চাদের একাডেমিকভাবে ভাল পারফর্ম করতে সাহায্য করে

গড়ে, যে বাচ্চারা পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটাচে, তারা স্কুলে আরও ভাল করার প্রবণতা রাখে। তারা যোগাযোগের দক্ষতা এবং শিক্ষার গুরুত্ব শেখে।

৩. আচরণগত সমস্যার ঝুঁকি কমায়

যে শিশুরা তাদের পরিবারের সাথে সময় কাটাচ্ছে তারা সহিংসতা এবং পদার্থের অপব্যবহারের মতো আচরণগত সমস্যাগুলির ঝুঁকি কম দেখিয়েছে। যখন তারা ইতিবাচক আচরণের জন্য ইতিবাচক মনোযোগ পায়, তখন এটি তাদের সুস্থ নিদর্শনগুলি চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা বাড়ায়। একটি শিশু যখন আপনার কাছে সমস্যা নিয়ে আসে তখন পরিবার তাকে নানা রকম সহযোগিতা করে। পরিবারের পরামর্শ তাদের সমস্যা মোকাবেলা করতে এবং ইতিবাচক পছন্দ করতে মনোবল দৃঢ় করে এবং উৎসাহিত করে।

৪. আত্মবিশ্বাস বাড়ায়

পরিবারের সাথে সময় কাটানো তার সকল সদস্যের জন্য আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। পিতামাতারা সমস্যা সমাধান এবং যোগাযোগের মতো নির্দিষ্ট দক্ষতার মাধ্যমে শিশুদের আত্ম-সম্মান গড়ে তুলতে শেখাতে পারেন।

৫. বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ প্যারেন্টিং দক্ষতা শিখতে সাহায্য করে

আপনি একসাথে যে স্মৃতিগুলি তৈরি করেন তা শিশুদের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎতের বাড়িতে একই প্রেমময় পরিবেশ গড়ে তোলার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলবে। পরিবার এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, আপনার উদাহরণের মাধ্যমে, আপনার বাচ্চারা গুরুত্বপূর্ণ যত্নশীল দক্ষতা শিখে যা তারা একদিন ব্যবহার করতে পারে।

৬. কার্যকর দ্বন্দ্ব সমাধান শেখায়

আমরা যখন পরিবারের সাথ সময় কাটাই তখন এটা মজার, কিন্তু এটা কঠিন ও হতে পারে। আপনি এতে একসাথে আছেন, তাই আপনার সামনে আসা সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য একসাথ কাজ করতে হবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা শেখায় যার মধ্যে স্বাস্থ্যকর, গঠনমূলক আলোচনা, বিতর্ক এবং সমস্যা সমাধানের উপায় রয়েছে।

৭. স্ট্রেস কমায়

যাদের শক্তিশালী পারিবারিক স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক রয়েছে তারা অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর আউটলেটের পরিবর্তে মানসিক চাপের জন্য স্বাস্থ্যকর মোকাবিলা করার পদ্ধতি খোঁজার প্রবণতা রাখে- যেমন বন্ধু এবং পরিবারকে বিশ্বাস করা মানসিক চাপ শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকগুলিকেও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে, যেমন ক্লান্তি, রক্তচাপ এবং হার্টের স্বাস্থ্য। দ্য অ্যানালস অফ বিহেভিওরাল মেডিসিন একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছে যে দেখা গেছে যখন

লোকেরা তাদের পাশে থাকা বন্ধুর সাথে (একা না হয়ে) তাদের জীবনের কষ্টগুলি নিয়ে অআলোচনা করে তখন তাদের নাড়ি এবং রক্তচাপ হ্রাস পেয়েছিল।

৮. অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিস্থাপকতা প্রচার করে

আপনার জীবনের পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষমতা একটি শক্তিশালী পারিবারিক বন্ধনের দ্বারা ব্যাপকভাবে উন্নত হয়। পরিবারের সাথে থাকা আপনাকে জানার অনুভূতি দেয় যে আপনি অন্তর্গত, আপনার যত্ন নেওয়া হয় এবং আপনার প্রয়োজন, যা অর্থ এবং উদ্দেশ্যের অনুভূতি দেয়। এই নিশ্চয়তা সামনে এগিয়ে যাওয়ার, বৃদ্ধি পেতে এবং সফল হওয়ার প্রেরণা দেয়।

৯. শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করে

সঠিক ধরনের কার্যকলাপের সাথে, পরিবারের সাথে সময় কাটানো শারীরিক সুস্থতার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে পরিবারগুলি বাড়িতে রান্না করা খাবার একসাথে খায় তাদের খাবার যারা খায় না তাদের চেয়ে ভাল খাবারের প্রবণতা রয়েছে। স্পোর্টস গেমস, হাইকিং বা একসাথে বাগান করার মতো আউটডোর ক্রিয়াকলাপগুলিতে অংশ নেওয়া ফিটনেস উন্নত করতে সহায়তা করে। এটি হৃৎপিণ্ড, হরমোন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে। পরিবারের সাথে থাকা একে অপরকে স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখতে উৎসাহিত করতে পারে।

১০. আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করে

স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক আপনার জীবনকালে ৫০% পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে। উপরে আলোচিত সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুবিধগুলি একত্রিত করুন, এবং আপনি দেখতে পাবেন কেন পারিবারিক সময় দীর্ঘ, স্বাস্থ্যকর, সুখী জীবনযাপনের সাথে যুক্ত হয়েছে।

❒ পারিবারিক বন্ধন সুস্থ ও প্রাণবন্ত করে

মানুষ একা নয়। কোনো না কোনোভাবে সে একত্রিত ও যূথব পরিবারমুখিতা মানুষের চিরয়ত ও সহজাত প্রকৃতি। এছাড়া জীবনের পরতে পরতে বিভিন্ন উপলক্ষে সে ক্রমশ যুক্ত হতে থাকা নানা সামাজিক বন্ধনে। এসব সম্পর্কের গাঁথুনি যার জীবনে যত সুনিবিড় ও দৃঢ়, জীবনটাও তার কাছে ততটা উপভোগ্য ও সহ সমাজতাত্ত্বিকদের পর্যবেক্ষণে এ আজ এক সার্বজনীন সত্য।

১.পারিবারিক বন্ধনে বাড়ে আয়ু

পারিবারিক একাত্মতা জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলে। বিজ্ঞানীরা রীতিমতো জোর দিয়ে বলছেন, পারিবারিক সম্প্রীতির সাথে মানুষের দীর্ঘায়ু অর্জনের সম্পর্কটা একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত। তাদের মতে, বাবা-মা, সন্তান ও ভাইবোদের সাথে কাটানো আনন্দঘন মুহূর্ত দীর্ঘায়ু লাভে বিশেষভারে সহায়ক। পারিবারিক বন্ধন যাদের দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে উল্টোটা। পারিবারিক একাত্মতার সুফল মানুষ পেতে শুরু করে জীবনের গোড়া থেকেই। যেসব পরিবারে বাবা-মা ও সন্তরনদের মাঝে সু- সম্পর্ক বিরাজমান, ক্যান্সারের মতো অসুখে পড়ার সম্ভাবন তাদের কম।

২. ভাইবোনের হৃদ্যতায় বাড়ে আনন্দ, কমায় বিষণ্নতা

ভাইবোনের সাথে সম্পর্কটা যাদের মধুর, তারা দৈহিকভাবে তুলনামূলক এবং মানসিক দিক থেকেও প্রজ্ঞাপূর্ণ জীবনযাপন করে এমনটাই মত গবেষকদের। ২০১৫- তে ২৪৬ টি পরিবারের সন্তনদের নিয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ভাইবোনের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে যারা যতটা ইতিবাচক ও একাত্ম, বিষণ্নতা হওয়ার হার ওদের ততটাই কম।

৩. দাম্পত্য সুসম্পর্কে প্রাপ্তি অশেষ

স্বামী/স্ত্রীর সাথে উষ্ণ ভাব- বিনিময় কথোপকথন আমাদের সম্পর্কটাকে গভীর আর মজবুত করে বটেই, সেই সাথে রাখে সুস্থ, বাড়ায় দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা।

৪. পারিবারিক বন্ধনে তৈরি হয় সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন

পারিবারিক আলোচনা, পরিবারের সাথে অন্তত একবেলা একসাথে খাওয়া ইত্যাদি আচরণ-অভ্যাসের পাশাপাশি সঙ্ঘবদ্ধভাবে নৈতিকতার চর্চায়ও মনোযোগী সে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে সাদাকায় আলোকায়নসহ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিন। সেখানে অন্যদের সাথে পরিচিত হোন, পরিবারের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিন। সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিবারে ধর্মবাণী ও আলোচনার ব্যবস্থা করুন।

সুষম পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আপনার ও আপনার পরিবারের সদস্য এবং প্রিয়জনদের পরিচালিত করুক সুস্থ এবং প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে।

সন্তান পালনে পারিবারিক বন্ধন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

জন্মের পর শিশুর সঙ্গে পরিবারের মানুষগুলোর সম্পর্কই হয় তার প্রথম পাঠ। মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য মানুষের সান্নিধ্যে থেকে এরা নিজের এবং বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা পায়। এই সম্পর্কের মাধ্যমে শিশুরা শেখে, কীভাবে অনুভুতি প্রকাশ করতে হয়। একটা শিশু যখন হাসে, কাঁদে, জিদ করে বা কোলে উঠতে চায়– তখন সে খেয়াল করে তার চারপাশের মানুষ তাকে কী 'উত্তর' দিচ্ছে। এটাই তার জন্য শেখার প্রথম ধাপ। কীভাবে ভাবতে হয়, বুঝতে হয়, কথা বলতে হয়, আবেগ প্রকাশ করতে হয়– এসব সামাজিক আচরণ ও যোগাযোগের দক্ষতা তাদের জন্মের প্রথম কয়েক বছরেই গড়ে গঠে।

তবে শুধু সন্তানের সঙ্গেই নয়, আশপাশের মানুষের সঙ্গে আপনার আচরণও প্রভাব ফেলে সন্তানের বিকাশে। আপনার সঙ্গী, বন্ধু, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, ঘরের কাজে সহায়তাকারীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছেন, তা শিশুরা খেয়াল করে। অনুকরণ করে। এভাবে তারা পরিবার এবং বাইরের মানুষের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হয়, শিখে নেয়।

➢ একসঙ্গে খেতে বসুনঃ

কর্মজীবী মা-বাবার ক্ষেত্রে সকাল বা রাতের খাবারই হয়তো একমাত্র সময়, যখন পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসার সুযোগ পান। এই সময়টুকু মুঠোফোন বা অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকুন। সন্তানকে গল্প বলুন, সারা দিন সে কী কী করেছে বা করতে চাইছে, জেনে নিন। পাশাপাশি সবার বঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন নিজির কোনো মজার ঘটনা বা অভিজ্ঞতা। এতে খেতে বসলেই টিভি বা মুঠোফোনের প্রতি শিশুর আকর্ষণ কমে আসবে। সে খাওয়ায় মনোযোগী হতে শিখবে, পাশাপাশি এই সময়ের গল্প, হাসিঠাট্টা শিশুকে মানসিকভাবে চাপমুক্ত থাকতে সাহায্য করবে।

শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর তার বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই শিশুর প্রায় ৮০ ভাগ মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথ (এনআইইউ)- এর গবেষণা বলছে, শিশুর জন্মের প্রথম দুই বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বময় শিশুর সঙ্গে তার পরিবারের মানুষগুলোর বন্ধন শিশুর ভবিষ্যতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে যত্নশীল না হলে সে দীর্ঘমেয়াদি মানসিক ও শারীরিক সমস্যায় ভুগতে পারে। এমনকি তার সম্ভাবনাময় গুণাবলিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

- **আচার-ঐতিহ্য পালনঃ** প্রত্যেক পরিবারেই কিছু আচার-ঐতিহ্য থাকে। শিশুকে ছোটবেলা থেকে সেসব পালনে উৎসাহিত করুন। পয়লা বৈশাখ, জাতীয় দিবস, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পারিবারিকভাবে উদযাপিত দিনগুলো

সবাই একসঙ্গে পালন করুন। শিশুকে শোনান এই বিশেষ দিনগুলোর তাৎপর্য। ইতিহাস জানার পাশাপাশি এতে তার মধ্যে স্বকীয়তা বোধ তৈরি হবে।

- **সবাই মিলে ঘরের কাজঃ** শিশুকে ঘরের কাজে উৎসাহিত করতে সবাই মিলে ঘরের কাজ ভাগ করে নেওয়ার বিকল্প নেই। ঘরের কাজে সহায়তাকারী থাকলেও বয়স অনুযায়ী ঘরের নানান কাজে আপনার শিশুকেও যুক্ত করুন। এতে শিশু যেমন দায়িত্ব নিতে শিখবে, তেমনি তার মধ্যে সবার সঙ্গে কাজ করার গুণ ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠেবে।

➢ ঘুরতে যান, একসঙ্গে খেলুনঃ

পরিবারের সবাই মিলে ঘুরতে যান। এতে মুঠোফোন, ট্যাব ব্যবহারের আসক্তি কমবে। সব সময়ই যে দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে হবে, এমন নয়। শিশুকে নিয়ে পার্ক, চিড়িয়াখানা, জাদুঘরে যেতে পারেন। ঘোরার পাশাপাশি শিশুকে সক্রিয় রাখতে তার সঙ্গে খেলুন। বাসার ছাদেই খেলতে পারেন। এতে সে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবে।

আরও যা করতে পারেনঃ শিশুর সঙ্গে কোনো প্রোজেক্ট করুন। শিশু ছোট হলে তার সঙ্গে লুকোচুরি, রং করা, পাজল মেলানো, গান শেখানো, নানান জিনিসের নাম শেখানোর মতো কাজে কাটতে পারে দারুণ সময়। আর সন্তান ইকটু বড় হলে তার সঙ্গে শব্দের খেলা খেলুন, কাগজ বা কাপড় কেটে বানান মজার মজার জিনিস, লেগো মেলান, বোর্ড গেম খেলুন। বাগান পরিচর্যা করা, ঘরে কোনো প্রাণী থাকলে এগুলোকে খাবার দেওয়া, স্কুলের কোনো কাজে সাহায্য করার মতো ব্যাপারে সন্তানের পাশে থাকুন, তাকে উৎসাহ দিন। এসব কাজ করার সময় তার সঙ্গে কথা বলুন। তাকে ভাবার সুযোগ করে দিন।

সন্তান পালনে প্রত্যেক মা-বাবা অবর্ণনীয় কষ্ট করেন। তবে শিশু যখন দায়িত্বশীল, ইতিবাচক গুণাবলি নিয়ে বেড়ে ওঠে, তখন কষ্টটাকে মনে হয় সার্থক!

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজ ও পরিবার

১. ভূমিকা

বিশ্বে মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমাজ বিদ্যমান। সমাজের প্রাথমিক সংগঠন রূপ হলো পরিবার। প্রকৃতপক্ষে পরিবারেই সমাজের উৎপত্তি। সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনার তাগিদে গড়ে উঠেছে পরিবার। কাজেই পরিবার হচ্ছে সর্বসময়ের মানব সমাজের কেন্দ্রস্থল। পরিবার একটি স্থায়ী সামাজিক সংগঠন। যে সংগঠন থেকে মানবজাতি বিকাশ লাভ করেছে এবং সেই সাথে সমাজের অগ্রগতি ও পরিবারের কাঠামোতেও

পরিবর্তন এসেছে। পরিবারের সাথে থাকে প্রত্যেক মানুষের অকৃত্রিম বন্ধন। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো অত্যন্ত মজবুত।

২. সমাজ ও পরিবার কাঠামোর সাথে পরিচয়

মানুষ সামাজিক জীব। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করাই মানুষের ধর্ম। কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্রে সংঘবদ্ধ হলে সমাজের উদ্ভব ঘটে। সমাজ বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা একটি সাধারণ ঐতিহ্য, প্রথা, জীবনপ্রণালি বা একটি সাধারণ সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একই সাথে বসবাস করে এবং একত্রে বসবাস করার ফলে একই মনেভাব প্রকাশ পায়। Aristotle বলেছেন, "যে মানুষ সমাজে বসবাস করে না, সে হয় পশু না হয় দেবতা"। ম্যাকাইভার ও পেজ (Maciver and Page) তাদের 'socicty' গ্রন্থে বলেছেন যে, 'সমাজ হলো আচার এবং কার্যপ্রণলি, কর্তৃক এবং পারস্পরিক সাহায্য দ্বারা পরিচালিত"। সমাজ বিজ্ঞানী গিডিংস (Giddings) বলেছেন, "সাধারণ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উদ্দেশ্য করে যখন একদল ব্যক্তি একত্রিত বা সংঘবদ্ধ হয় এবং যখন পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করে, তখন তারা একটি সমাজ গঠন করে বলা যায়"।

সমাজ মূলত একটি সংগঠন বিশেষ। সমাজ গঠিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে। সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে পাস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিথস্ক্রিয়ার ফলেই সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। পরিবার একটি চিরস্থায়ী সামাজিক সংগঠন। মানবজাতির বিকাশ লাভের সাথে সাথে সমাজের অগ্রগতি ও পরিবারের রূপ এবং কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী M. F Nimkoff তাঁর Marriage and the Family নামক গ্রন্থে পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "পরিবার মোটামুটিভাবে স্বামী ও স্ত্রী দ্বারা সৃষ্ট একটি সংঘ যেখানে সন্তান-সন্ততি থাকতে ও পারে, আবার নও থাকতে পারে।" সুষ্ঠু পারিবারিক জীবনই সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলভিত্তি। পরিবার একটি সার্বজনীন স্থায়ী এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এক সামায়িক চিরন্তন বিদ্যালয় বলা হয়। তাই মানব সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ায় পরিবারকে বৃহত্তর সমাজের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা হয়।

ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, "সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের নিমিত্তে যৌন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে।" সমাজবিজ্ঞানী R. M. Maciver এর মতে, "যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা জীবনযাপন করি, তার সংগঠিত রূপই সমাজ।"

Edwrd Westmark এর মতে, "সমাজ হচ্ছে একদল ব্যক্তির সমষ্টি যারা পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবনযাপন করে।" আবার পরিবার কেবল সন্তানদের বিভিন্ন সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজনই মেটায় না, সমাজ

জীবনের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, রীতি নীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জীবনদর্শনের সঙ্গে সন্তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। পারিবারিক জীবনেই মানুষ সর্বপ্রথম সমবায় জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। পারিবারিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই শিশুর চিন্তা ও চেতনার বিকাশ ঘটে। এ প্রাথমিক জ্ঞানই সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। সুস্থ সামাজিক জীবনের জন্য এবং শিশুর যথার্থ কল্যাণের জন্য পরিবার সমাজের জন্য অপরিহার্য।

৩. পরিবারের শ্রেণিবিভাগ

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আকারের মধ্যে পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটতে থাকে। পরিবারের কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমেই পরিবারের প্রকারভেদ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে পরিবারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১। ক্ষমতার মাত্রা: ক্ষমতার মাত্রা অনুযায়ী পরিবারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. পিতৃপ্রধান পরিবার (Patriarchal Family)- পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা যখন পরিবারের বয়স্ক পুরুষের ওপর ন্যাস্ত করা হয় তখন তাকে পিতৃপ্রধান পরিবার বলা হয়। আমাদের সমাজে পিতৃপ্রধান পরিবারই লক্ষ্য করা যায়।

খ. মাতৃপ্রধান পরিবার (Matriarchal Family)- যে পরিবারে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা পরিবারের বয়স্ক মেয়েদের ওপর ন্যাস্ত থাকে তাকে মাতৃপ্রধান পরিবার বলে। বাংলাদেশে গারো উপজাতিদের মধ্যে মাতৃপ্রধান পরিবারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

২। স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী: স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী পরিবারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. একপতি-পত্নিক পরিবার (Monogamy)- একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী নিয়ে যখন পরিবার গঠিত হয় তখন তাকে একপতি-পত্নিক পরিবার বলে। আধুনিক সমাজে এ ধরণের পরিবারই প্রচলিত।

খ. বগুপত্নিক পরিবার (Polyandry)- যে পরিবারে একজন পুরুষ একের অধিক স্ত্রীলোক নিয়ে সংসার গঠর করে তখন তাকে বহুপত্নিক পরিবার বলে। মুসলিম সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

গ. বহুপতি পরিবার (Polyandry)- যে পরিবারে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকে তাকে বহুপতি পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবার আজকাল দেখা যায় না।

ঘ. গোষ্ঠী পরিবার (Group Marriage)- দুই বা ততোধিক পুরুষ বা স্ত্রীলোকের একত্রে বসবাসের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে গোষ্ঠী পরিবার বলে। আদিম সমাজে এ ধরনের পরিবার বিদ্যমান ছিল।

৩। বাসস্থানের অধিকার অথবা বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান অনুযায়ী: বাসস্থানের অধিকার অথবা বিবাহোত্তর বাসস্থানের স্থান অনুযায়ী পরিবার ৪ প্রকার। যথা:

ক. পিতৃবাসস্থান পরিবার। (Patriarch Family) - পিতৃবাসস্থান পরিবারের স্ত্রী বিবাহের পর পিতৃ গৃহ ছেড়ে স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাস করে এবং স্বামীর গৃহে তার অধিকার গন্য হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের পরিবার বেশী।

খ. মাতৃবাসস্থান পরিবার (Matriarch Family) - যে পরিবরের স্বামী বিয়ের পর স্ত্রীর গৃহে স্ত্রীসহ বসবাস করে তাকে মাতৃবাসস্থান পরিবার বলে। গাড়ো সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা মেলে।

গ. নয়াবাস পরিবার (Neolocal Family) - যে পরিবারের স্বামী-স্ত্রী বিয়ের পর নতুন বাড়িতে তাদেরে দাম্পত্য জীবন শুরু করে তাকে নয়াবাস পরিবার বলে। পাশ্চাত্য সমাজে ও বর্তমানে আমাদের দেশেও প্রচুর নয়াবাস পরিবার দেখা যায়।

ঘ. দ্বৈতবাস পরিবার (Deolocal Family) - নব দম্পত্তি যদি কিছু দিন শ্বশুর বাড়ি এবং কিছু দিন বাবার বাড়িদে বসবাস করে তবে সে পরিবারকে দ্বৈতবাস পরিবার বলে।

৪। বংশ মর্যাদা ও উত্তরাধিকার: বংশ মর্যাদা ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. পিত্রসূত্রীয় (Patriarchal Family) - যে পরিবারে সন্তানেরা পিতার সম্পত্তি ও বংশ মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে সেই পরিবারকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার বলা হয়। আমাদের সমাজের পরিবার পিতৃসূত্রীয়।

খ. মাতৃসূত্রীয় পরিবার (Matriarchal Family) - যে পরিবারের সন্তানেরা মাতার সম্পত্তি ও পবংশ মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে সেই পরিবারকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। গাড়ো সমাজে মাতৃসূত্রীয় পরিবার দেখা যায়।

৫। পরিবারের আকার অনুযায়ী : পরিবারের আকার এর ভিত্তিতে পরিবারকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন:

ক. একক পরিবার (Nuclear Family) - যে পরিবারের স্বামী তার স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে পৃথকভাবে বাস করে তাকে একক পরিবার বলে। বাংললাদেশের শহর অঞ্চলে একক পরিবারের সংখ্যা বেশি দেখা যায়।

খ. যৌথ পরিবার (Joint Family)- যে পরিবারে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, ভাইবোন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি, নিকট আত্মীয়-স্বজন একত্রে বসবাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে। গ্রাম অঞ্চলে কৃষি প্রধান সমাজে যৌথ পরিবারের সংখ্যা বেশি। আবার আধুনিক যুগে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে যৌথ পরিবারের সংখ্যা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।

গ. বর্ধিত পরিবার (Extended Family) -যৌথ পরিবারের একটি বর্ধিত রূপই হলো বর্ধিত পরিবার।

৬। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে : পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. বহিঃগোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার (Exogamous Family) এ ধরনের পরিবারে ব্যাক্তিকে অবশ্যই গোত্রের বাইরে বিয়ে করতে হয়।

খ. অন্তঃগোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার (Endogamous Family) -এ ধরনের পরিবারে ব্যাক্তিকে অবশ্যই নিজের গোত্রের মধ্যে বিয়ে করতে হয়।

৪. পরিবারের বৈশিষ্ট্য

পরিবার হচ্ছে আদিম, স্থায়ী ও চিরন্তন সমাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারকে বর্তমান যুগে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা হয়। পরিবারের কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যার ভিত্তিতে সেই প্রতিষ্ঠানকে আমরা পরিবার বলে পারি। পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১। পরিবার একটি ক্ষুদ্র বর্ণ পরিবারের আকৃতি ক্ষুদ্র। এর সদস্য সংখ্যা যদিও কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই তবে এর আকার বৃহদাকার হয় না। সংগত কারণেই বড় পরিবার বিভক্ত হয়ে ছোট পরিবারে রূপ নেয়।

২। সদস্য সংখ্যা: পরিবারের সদস্য সংখ্যা সব সময় যে নির্দিষ্ট সংখ্যক হতে হবে তা নয়। এখানে স্বামী-স্ত্রী নিয়ে সংসার গঠিত হয়। এখানে সন্তান থাকতে পারে আবার নাও পারে।

৩। বৈবাহিক সম্পর্ক: পরিবার বৈবাহিক বন্ধনি দিয়ে আবদ্ধ। সন্তান সন্ততির জন্ম এবং লালন-পালন এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪। সামাজিক একক : পরিবার সমাজে একক। সমাজ বহু পরিবারের সমষ্টি। পরিবারের বিস্তৃতি হুবিজ সামাজিক সংগঠনের কাঠামো রচনা করে। অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হলো পরিবার।

৫। নৈতিক মূল্যবোধ: স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও নির্মল চরিত্র গঠন পরিবারের অন্যতম ভিত্তি।

৬। সর্বজনীনতা: পরিবারের অস্তিত্ব সার্বজনীন। মানব সভ্যতার বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে পরিবারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মানুষ মাত্রই পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক কথায়, পরিবার হলো মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের সার্বজনীন রূপ।

৭। বংশ : বংশ সংরক্ষণ পরিবারের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

৮। গঠনমূলক প্রভাব: জন্ম থেকে শুরু করে মানুষ পারিবারিক পরিবেশে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং মানুষের জীবনের ওপর পরিবারের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এভাবে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি গঠনমূলক মনোভাব গড়ে ওঠে এবং তাদের জীবনের সবক্ষেত্রে এই গঠনমূলক মনোভাবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এতে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। এর মাধ্যমে পরিবারের শিশুদের চরিত্র গঠন হয়।

৯। আবেগীয় ভিত্তি: পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মায়া-মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি আবেগীয় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে । একে অপরের সুখ-দুঃখে পাশে থাকে।

১০। পারিবারিক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা: পরিবার গঠনের জন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য। পারস্পরিক বিশ্বাস যত মজবুত হয় পরিবারের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা তত বেশি বৃদ্ধি পায়। পরিবারের সদস্যরা একে অপরের ওপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্য নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহের কষ্ট করে।

১১। পরিবারের স্থায়িত্ব: পরিবারের স্থায়িত্ব একটি বড় বৈশিষ্ট্য। একটি আদর্শ পরিবার গড়ে তুলতে হলে পরিবারের স্থায়িত্বের প্রয়োজন। মূলত অনেক পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের

সমঝোতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহায়তার মাধ্যমে যেকোনো পরিবার বংশ পরম্পরা ।

৫. পরিবারের কার্যাবলি ঃ

পরিবার একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন। অনান্য সামাজিক সংগঠনের মতো পরিবার সামাজিক চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন রকম কাজ করে। পরিবারে এমন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে বা অত্যন্ত মৌলিক এবং যার সব

সমাজেই কম বেশি লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের জানতে হবে পরিবার কেন সৃষ্টি হয়েছিলো।

⇒ **পরিবার সৃষ্টির কারণগুলো হচ্ছে -**

- সমাজ ও ধর্ম স্বীকৃত যৌনানুভূতির চাহিদা;
- সন্তান লাভের ইচ্ছা;
- বংশ মর্যাদা রক্ষা;
- জীবনের নিরাপত্তা;
- অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।

পরবর্তীকালে যুগের পরিবর্তনে বিশ্বায়নের ফলে পরিবারের কার্যাবলিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আদিম যুগ ও মধ্যযুগের পরিবারের সাথে বর্তমান পারিবারিক জীবনের কার্যাবলির তুলনা করলে তা সহজে অনুমান করা যায়। বর্তমানে পরিবারের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. **জৈবিক কাজ (Biological Functions)ঃ** জৈবিক চাহিদা মানুষের চিরন্তন। পরিবারের জৈবিক কাজ প্রধানত দু'টি- ক) জৈবিক চাহিদা বজায় রাখা, খ) সন্তান জন্মদান করা।

২. **মনস্তাত্ত্বিক কাজ (Psychological Functions)ঃ** বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন ও সন্তান লালন-পালনের কাজটি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক কাজ। স্বামী-স্ত্রীর একত্র বসবাস, শিশুর প্রতি পিতা মাতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া-মমতা, আদর-যত্ন সবই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। শিশু লালন-পালনের দায়-দায়িত্বের ভিত্তি হলো শিশুর প্রতি মমত্ববোধ। শিশুর পরিচর্যা, শিক্ষা, সামাজিকীকরণ এবং তাকে স্নেহের পরশে লালন -পালনের কাজটি পরিবারই করে থাকে। শিশুর সুষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক বন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারি ভূমিকা রাখে।

৩. **নিরাপত্তা ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (Security and Maintenance)ঃ** পরিবারের সকল সদস্যের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষন করা পরিবারের অন্যতম প্রধান কাজ। শিশু ও বৃদ্ধরা পরিবারে সবচেয়ে অসহায়। তাদের রক্ষনাবেক্ষন এর দায়িত্ব পরিবারের সক্ষম সদস্যদের।

৪. **আর্থিক কাজ (Economic Funcetions)ঃ** পরিবারে অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা। কৃষি সভ্যতা বিকাশের পর থেকে পরিবারকে আর্থিক কাজ সম্পাদন করতে হয়। ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজ পরিবারের সদস্যরাই করে থাকে। এছাড়া কুটির শিল্পের কাজও পরিবারগুলো করে থাকে। গ্রামীন অর্থনীতিতে পরিবার হচ্চে একটি উৎপাদনের একক। বর্তমানে গ্রামীন পরিবারগুলো উৎপাদন, আয় এবং ভোগের একক। গ্রামে নারী-পুরুষ মিলে কৃষি

কাজ করে ফসল উৎপাদন করে, কুটির শিল্প সামগ্রী তৈরী করে। অর্থনীতিক ব্যবস্থায় সরকার অনেক নিয়ম, নীতি বা আইন-কানুন প্রবর্তন করে। পরিবারকে সেই আইন মেনে জীবিকা নির্বহের মাধ্যেমে অর্থনৈতিক কার্য সমাধা করতে হয়।

৫. **শিক্ষামূলক কাজ (Education Functions):** পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষাদান করা। পরিবারই হচ্ছে শিশুর প্রাথমিক পাঠাকগার। এখানে অনানুষ্ঠানিকভাবে পিতামাতা শিশুকে শিক্ষা দেন। পরবর্তীকালে শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

৬. **ধর্মীয় শিক্ষাদান (Religions Function):** পরিবারই উপযুক্ত স্থান, যেখানে সন্তানেরা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে।

৭. **সামাজিকীকরণ (Socialization):** পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী শিশুকে আচার-আচরণ করার শিক্ষা দেওয়া। শিশু হসামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি, আদব-কায়দা, সাংস্কৃতি ধ্যান-ধারণা সমন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার থেকেই লাভ করে।

৮. **রাজনৈতিক কাজ (Political Functions):** পরিবার হচ্ছে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবিশেষ। পিতামাতা হচ্ছে সে রাষ্ট্রের প্রধান। আর পরিবার নামক এ রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে সন্তানদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৯. **চিত্তবিনোদনমূলক কাজ (Recreational Functions):** পরিবারে অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে অবসরযাপন ও চিত্তবিনোদন। অতীতে পরিবারের সদস্যদের অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা পরিবারের মধ্যেই সম্পন্ন হতো। বর্তমানে নানা প্রযুক্তি, পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র, ভ্রমণ ইত্যাদি চিত্তকে প্রফুল্ল করে। কিন্ত নিরাপত্তা ও প্রফুল্লতার জন্য আজও পরিবারকেই বড় বিনোদনের কেন্দ্র বা মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়।

১০. **সম্পত্তির উত্তরাধিকার (Inheritance of Property): পারিবারিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রেই এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা সকল সমাজব্যবস্থায় বর্তমান।**

১১. **স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Maintenance of Health):** স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব দায় দায়িত্ব পালনে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যায় পরিবারের ভূমিকায় মুখ্য। বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে।

পরিবারের উপর পরিবর্তনশীল সমাজের প্রভাব

শিল্পায়ন, নগরায়ন, যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি এবং আধুনিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বর্তমান সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অনুশাসন

প্রভৃতির মধ্যে পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলে। পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, পরিবার থেকেই সমাজের উৎপত্তি। সামজিক পরিবর্তন একটি অবিরাম চলমান প্রক্রিয়া। পরিবার সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজ পরিবর্তনের ফলে পরিবারের চিরাচরিত গতিধারায় যে পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো হলোঃ

১। পরিবারের আকার ও কাঠামোতে পরিবর্তন ঃ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ১৫ ভাগ মানুষ নগর সমাজে বসবাস করে যারা মূলত বিভিন্ন পেশায় জড়িত। কিন্তু বর্তমানে জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ ঘর ছাড়ছে। গ্রামীন মহিলারা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিচ্ছে। ধনী কৃষক পরিবারের মেয়েরাও উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করে চাকুরিতে নিয়োজিত রয়েছে। ফলে মেয়েদরে ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার অনূকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। নগরায়ন ও শিল্পায়ন এর প্রভাবে গ্রামের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। সাধারন ভাবে পরিবারের দায়িত্ব মূলত স্বামীর। বর্তমানে অনেক মহিলারায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে অর্থ উপার্জন করতে শুরু করেছে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে গ্রামের স্বামী স্ত্রীরাও সচেতন হয়ে উঠেছে। ফলে পরিবারের আকার ও কাঠামো ছোট হয়ে আসছে।

২। বিবাহ পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঃ আগে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রী নির্বাচনে বংশ মর্যাদা পরিবারের প্রধানের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হতো। বর্তমানে পাত্র পাত্রী নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করে অথবা বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় । এসব পরিবর্তন আধুনিক সন্তানেরা সহজে গ্রহণ করেছে। বর্তমান সমাজ আধুনিক প্রয়োজনীয়তা ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে টিভি, মোবাইল ও ইন্টানেটে যোগাযোগ উন্নয়নে ফলশ্রুতিতে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের দেশে পড়েছে। এতে জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু পরিবারের উপর এর প্রভাব পড়ে মানুষ তার জীবনযাত্রা পরিবর্তন করেছে। একাধিক বিয়ে প্রবনতা হ্রাস পেয়েছে।

৩। বিবাহ বিচ্ছেদের প্রবণতা বৃদ্ধি ঃ ব্যক্তিত্বের সংঘাত, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার অভাব, মতের অমিল, পারস্পারিক দ্বন্দ ইত্যাদি কারণে বর্তমান সময়ে পরিবার গুলোতে বিবাহ বিচ্ছেদের বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতা উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে ক্রমাগত বাড়ছে।

৪। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মহিলাদের অংশগ্রহন ঃ বর্তমানে আমাদের দেশের মেয়েরা অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছে । শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তনের সাথে সাথে মহিলারা অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী হচ্ছে। কুসংস্কারের বেড়া জাল পেরিয়ে মেয়েরা আজ উপার্জনের পথ খুজেঁ নিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কৃষিতে মেয়েদের অবদান অবিস্মরনীয়, পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের অংশ গ্রহন আমাদের দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। দিন দিন নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে। কুটির শিল্পে বরাবরই মেয়েরা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।

৫। পারিবারিক কার্যাবলিতে পরিবর্তন ঃ বর্তমানে পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যবলিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কর্মজীবি মহিলার সংখ্যার দিন দিন বাড়ছে। শিশুদের দেখাশুনার জন্য অনেক দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান নিজ কর্মীদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রে রেখে চাকুরি করতে পারছে। যদিও এই ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

৬। আবাসন পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঃ আবাসন পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষনীয়। সামর্থ্যের মধ্যে থাকলেও বাড়ি তৈরির চেয়ে ফ্লাটে বাস করতে অনেকে নির্ঝঞ্ঝাট ও স্বাচ্ছ্যন্দ্যবোধ করছে।

৭। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঃ তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের ফলে পৃথিবী ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। ঘরে বসে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেটে মাধ্যমে কয়েক মূহূর্তে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন খবর ছবিসহ আমরা দেখতে পাই। বিদেশে থাকা প্রিয়জনদের সাথে স্কাইপিতে সহজেই কথা বলতে পারছি। তবে অবাধ বাণিজ্যের নেতিবাচক প্রভাবক পরিবারগুলোকে গ্রাস করেছে।

৮। খাদ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ঃ বিভিন্ন গৃহস্থালী তৈজসপত্র আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। প্যাকেটজাত গুড়াঁমসনলা থেকে শুরু করে নানা উপাদান রান্নার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে। বিভিন্ন সুপারমলে প্রক্রিয়াজাতৃকত করা মাছ, মুরগি, কাটা সবজি পাওয়া যাচ্ছে যা পরিবারের কাজকে অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

৯। ধর্মীয় নিয়ন্ত্রন হ্রাস ঃ মানুষর মূল্যবোধ অবক্ষয়ের সাথে সাথে ভোগ বিলাসিতা মানুষ একক ভাবে ভোগবাধী হয়ে উঠেছে। বাড়ছে দূর্নীতি, স্বার্থপরতা, হানাহানি, হিংস্রতা, ধর্মীয় অনুশাসন দিন দিন কমছে যার প্রভাব পড়ছে পরিবার তথ্য সমাজের উপর ।

১০। পারিবারিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঃ সামজিক পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক প্রথা, আচার আচরন ও মূল্যবোধের পরিবর্তন এসেছে। যৌতুক প্রথা, বহু বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে , কুসংস্কারে বিশ্বাসের ও প্রবণতাও কমেছে ।

পরিশেষে বলা যায়, যুগের পরিবর্তনে সমাজে যে, পরিবর্তন হচ্ছে তার প্রভাব পড়েছে পরিবারের উপর তবে পরিবার কাজগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে তার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখেছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পরিবার জীবনকে করে তুলেছে আধুনিক গতিশীল।

৭. পারিবারিক বন্ধন (Famillal Bonding)

পারিবারিক বন্ধন হলো পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে তৈরি হওয়া সম্পর্ক। পারস্পরিক বিশ্বাস,স্নেহ, ভালোবাসা, সম্মান, আস্থা ইত্যাদি হলো পারিবারিক বন্ধনের ভিত্তি। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় না হলে পরিবারের অস্থিত্ব সংকটের মুখে পড়ে। পারিবারিক বন্ধন শিশুর সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলত শিল্পায়ন, নতুন নতুন নগরায়ন ও বন্দরের পত্তন এবং শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাকরিজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একক পরিবারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ব্যক্তি স্বতন্ত্যের প্রভাবের ফলে আমাদের দেশে পারিবারিক বন্ধনেও নানা রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

৮. পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার জন্য পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা

পরিবারই একমাত্র কেন্দ্রস্থল যেখানে মায়া-মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা, সহানুভূতি লাভ করা যায়। পরিবারের ভালোবাসাই পারে সদস্যদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে।

১। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের পরস্পরের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থাকতে হবে। একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ থাকতে হবে।

২। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের সুখ, দুঃখ এবং কাজগুলো সবার মধ্যে ভাগ করে নেয় ফলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বাড়ে ও পারিবারিক বন্ধন শক্ত হয়।

৩। পরিবারের বন্ধন অটুট রাখা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা বাবা-মা এবং সন্তনদের কর্তব্য।

৪। বাবা-মাকে ছেলেমেয়েদের সাথে সবসময় বন্ধুর মতো মেশা উচিত। তাদের সব সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। এতে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ পায় এবং পিতামাতার সাথে দ্বন্ধে জড়িয়ে পড়ে না। শিশু পরিচালনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক শিশুই স্বতন্ত্র। তাদের স্বতন্ত্রতা অনুযায়ী তাদেরকে বুঝতে হবে। শিশুদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক চাহিদারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

৫। পারিবারিক বন্ধন টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবারে শুধুমাত্র বড়দের নয় ছোটদেরও দায়িত্ব থাকে।

৬। পরিবারের সদস্যদের উদারতাই পারিবারিক বন্ধনের চাবিকাঠি। পরিবারের সদস্যদের স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা সংসারে অশান্তি ডেকে আনে।

৭। অর্থনৈতিক সংকট অঅমাদের পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার বড় অন্তরায়। পরিবারের প্রতিটি সদস্যই যদি তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে তবে পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয় না। এতে করে পরিবারে কেউ কারো ওপর নির্ভরশীল হয় না এবং পরিবারের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।

৮। পরিবারের যেকোনো সদস্য কোনো খারাপ পথে পরিচালিত হলে তাকে ভালোবাসার মাধ্যমে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৯। পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য, সমঝোতামূলক নিবিড় সম্পর্ক পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে, পরিবারে শান্তি বজায় রাখে, সুস্থ ও গতিশীল পারিবারিক জীবন দান করে। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের আন্তরিকতা, সহযোগিতাই পারে পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে।

১০। পরিবারের কোনো সদস্য বিপদগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করতে হবে। এর ফলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আশ্বস্ত হবে।

৯. পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙন এবং শিশুর ওপর এর প্রভাব

পরিবার ভাঙনের ফলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ওপরই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা, যেমন-

১। বাবা-মার পারিবারিক সম্পর্কে যেখানে সুসম্পর্ক নেই সেখানে শিশু তার স্বাভাবিক মেধা বিকাশে প্রতিনিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তার বিকাশ সাধন ব্যাহত হয় এবং সে বিপথে পা বাড়ায়।

২। সন্তানের প্রতি বাবা-মার অবহেলা, অনাদরের প্রভাবে সন্তান বাবা-মার প্রতি আস্থাহীন ও অন্তর্মূখী হয়ে ওঠে।

৩। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখেছেন সংসারের অবহেলিক শিশুরা কীভাবে বাইরের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। পারিবারিক সংকট শিশুর মৌলিক আত্মবিশ্বাস অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে শিশু আস্থা অর্জন করতে পারে না, হীনমন্যতায় ভোগে।

৪। শিশু অসামাজিক হয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

৫। পারিবারিক সংকট শিশুকে ভীতু, পরনির্ভরশীল, দায়িত্বহীন ও উদাসীন করে।

৬। পরিবার ভাঙনে কিশোররা হতাশাগ্রস্ত হয়। তাদের মধ্যে অপরাধবোধ দেখা দেয় এবং তারা কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

৭। পারিবারিক ভঙনে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যখন পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না তখন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হতাশা-দ্বন্ধ ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হয় ।

৮। পরিবার ভাঙনে তরুনরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন নেশায় জড়িয়ে পড়ে। তারা চুরি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়।

৯। পরিবার ভাঙনে

বয়স্করাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বয়স্করা শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে অপরের ওপর নির্ভরশীল থাকে। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার কারণে তাদের ওপর মনোযোগ কম থাকে এবং তারা অসহায় হয়ে পড়ে। অতএব, পরিবার ভাঙনের ফলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যই কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবারের প্রতিটি সদস্যর উচিত পারিবারিক ভিত্তি যেন নড়বড়ে না হয়ে যায় সেদিকে সজাগ থাকা।

১০. পরিকল্পিত পরিবার

পরিকল্পিত পরিবার বলতে বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রী, তাদের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা বিচার করে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সন্তান গ্রহণ করে একটি সুখী পরিবার গঠনের প্রচেষ্টাকে বোঝায়। অন্যভাবে জনসংখ্যা হ্রাস করাকে বোঝায়। পরিকল্পিত পরিবারে এমন একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যা দিয়ে একটি সুখী, স্বাস্থ্যবান ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠন করা যায়। অন্যদিকে অপরিকল্পিত পরিবার এর ঠিক বিপরীত। এ ধরনের পরিবারে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না। স্বামীর আর্থিক দিক বিচার করা হয় না, স্ত্রীর শরীর স্বাস্থ্য বিবেচনা না করে একের পর এক সন্তান জন্ম দিয়ে পরিবারটাকে অহেতুক বড় করতে থাকে, যার ফলে অতি সহজেই এ অপরিকল্পিত পরিবারটি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি ছোট আদর্শ ও সুখী পরিবার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা ও তা নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবারের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা। বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ। বাংলাদেমের আটষট্টি হাজার গ্রামের শতকরা নব্বই ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। নিরক্ষরতা, অজ্ঞাতা ও সামাজিক কুসংস্কারের জন্য এদেশে জনসংখ্যা নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের জাতীয় আয়ের তুলনায় বাংলাদেশে জনসংখ্যার হার অনেক বেশি। নিচের সুবিধাগুলো রক্ষার্থে বাংলাদেশে তাই পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

১১. পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধঃ বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আগামীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। তাই পরিকল্পিত পরিবারের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা আবশ্যক ।

২। খাদ্য ঘাটতি দূর করাঃ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রয়োজনীয় খাদ্যৎপাদন কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত পরিবার গঠন।

৩। বেকার সমস্যা দূরীকরণঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আমাদের কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে বহু যুবক বেকারত্বের শিকার হচ্ছে। এ সমস্যা দূর না করতে পারলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হুমকির মুখে পড়বে। এ কারণে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণঃ পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ করা সম্ভব। অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি যে অতরিক্ত আয় সৃষ্টি হচ্ছে তা অপরিকল্পিত পরিবারে জনর্সখ্যার ভরণপোষণের চাপে ব্যয় হওয়ার কারণে মূলধন পরিমাণমহ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কাজেই পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অত্যান্ত বেশি।

৫। সামাজিক অনাচার রোধঃ অপরিকল্পিত পরিবার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না। যার ফলে অপরিকল্পিত পরিবারের সদস্যরা মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়াতে নানা রকম অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, পকেটমার ইত্যাদি অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে সমাজকে ও পরিবারকে ও পরিবারকে কলুষিত করছে। এই অসামাজিক কার্যকলাপ রোধ করতে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণঃ অপরিকল্পিত পরিবারে মা শিশুর স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয় যার ফলে সারাজীবন ধুকে ধুকে অপুষ্টিতে জীবন শেষ করে। অধিক সন্তানের কারণে পরিবারে সকল সদস্য তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে পরিবারের সুস্থতা বিনষ্ট হয়। পরিকল্পিত পরিবারের মাধ্যমে মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

কাজেই আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র অসচ্ছল পরিবারের জন্য নয়, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সব পরিবারের জন্য বর্তমানে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২. পরিকল্পিত পরিবারে সন্তান পালনের সুবিধা

পরিবারকে আদর্শ, সুখী ও সচ্ছল করার জন্য পরিকল্পিত পরিবারের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজর বিদিত। পরিবারে পছন্দ অনুযায়ী যদি সন্তান আসে তাহলে তার পরিচর্যায় সাধারণত কোন ত্রুটি থাকে না। সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তার পরিচর্যা আরম্ভ হয়। সুস্থ মা সুস্থ সন্তানের জননী । মার সুস্থতার কারণে সন্তান সুস্থ হিসেবে ভূমিষ্ঠ হয় ও মা নিজেও সন্তানকে সুন্দর এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বড় করে তুলতে পারেন। তিনি সন্তানকে সময় দিতে পারেন ও সন্তানের যত্নেরপ্রতি গভীর মনোযোগ দিতে পারেন। শিশুর প্রয়োজনমত খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা সব মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবারের সদস্যরা শিশুর লালন-পালন অধিক সময় দিতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবারে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয়ে থাকে। শিশুদের এক্ষেত্রে সব ধরণের প্রয়োজন পরিবার মেটাতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবার আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হয় বলে শিশু জন্মবার পর থেকে তার সব চাহিদা মা-বাবা পূরণ করতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবারে শিশুর মানসিক ভাবে সুস্থ ও ভাল থাকে, হাসিখুশি থাকে। শিশু এক অনাবিল স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার মধ্যে এক সুন্দর পরিবেশে বড় হয়। শিশু শৈশবকাল থেকে উপযুক্ত স্নেহ-মায়া-মমতায় বড় হয় বলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ভাল হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী তার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশকে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে শিশু ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

১৩. শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পরিকল্পিত পরিবারের ভূমিকা

পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক কাজের জন্যই সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পিত পরিবারে আয় অনুযায়ী সন্তানের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিবার গঠনের প্রচেষ্টা করা হয়। এ ধরনের পরিবারে আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত হওয়া প্রয়োজন তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অর্থৎ পরিকল্পনার ভিত্তিতে গঠিত পরিবারকে পরিকল্পিত পরিবার বলে। পরিবারের সন্তানদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার ওজরই পরিবারের সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। বাবা-মার সচেতন পরিকল্পনার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এ ধরনের পরিবারেই মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আহার ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান সম্ভব। একজন সুস্থ মায়ের গর্ভে সুস্থ সন্তান জন্ম নিতে পারে এবং জন্মের পর উপযুক্ত আদর যত্নে সুষ্ঠুভাবে লালিত পালিত হতে পারে।

পশ্চিমা সমাজের অবস্থা

পশ্চিমা সমাজের অবস্থা হলো, সেখানে যৌন-রোগের ছড়াছড়ি, জীবিত মা-বাবার এতিম সন্তানই বেশি, যুবকদের বিয়ের প্রতি অনীহা, নারী-নির্যাতন বৃদ্ধি, বুড়ো বয়সে আশ্রয়হীন জীবন-যাপন, মাদক সেবন বৃদ্ধি, অ্যালকোহল সেবন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা হ্রাস, অনেক দেশে বিশেষ করে ইউরোপে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। কারণ

বিয়ে-শাদি নেই, বিয়ের প্রতি অনীহা, ঘর-বাড়ি বিরাণভূমি, পরিবার নেই, বৈধ সন্তানের চেয়ে জারজ সন্তানের সংখ্যা বেশি। এটা হলো পশ্চিমাদের সমাজের চিত্র।

পশ্চিমা বিশ্বে নারীর বাকস্বাধীনতা : বিশ্বে যারা ভোটাধিকারের কথা বলে, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯২৮ সালের আগে ইংল্যান্ডে নারীরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আমেরিকার মধ্যে নারীরা ১৯২০ সালের আগে ভোট দিতে পারেনি। ইতালিতে ১৯৪৫ সালের আগে নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ সালে, কানাডায় ১৯৪৮ সালে, জাপানে ১৯৪৫ সালে নারীর ভোটাধিকার নিশ্চিত হয়। সূত্র: 'মুতালায়ায়ে সিরাত (সা.)'- লেয়াকত আলী খান নিয়াজি, পৃ. ৩৬৫

দেড়'শ বছর আন্দোলনের পর ১৯৭১ সালে আরমরিকায় নারী আইন পাস হয়। আবার ৮২ সালে ক্যানসেল করে দেওয়া হয়। ৯৪ সালে আবার আইন পাস হয়। আমেরিকান একজন লেখক, গবেষক নারীদের নিয়ে একটি বই লিখেছেন। বইয়ের নাম " women in the work place"(চাকরির স্থানে নারী)। তিনি এ বইয়ের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের নারীদের করুন অবস্থা তুলে ধরেছেন যে আমাদের দেশে দরিদ্র হলো নারী, তাদের মধ্যে মানসিক রোগ ধরা পড়েছে এবং নারীরা সব জায়গায় নিগ্রহ-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এক জরিপে দেখা যায়, ১৯৯৮ সালে আমেরিকায় ৪০ মিলিয়ন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নারী তার স্বামী, প্রাক্তন স্বামী ও বয়-ফ্রেন্ডের হাতে নির্যাতিত হয়েছে।

some of the costs of the sex gender system. The poverty of women and children, the double day, high rates of mental illness (especially depression) among women, women battering and rape (women in the work place by Richardson)

তারা নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত এবং বহু দিন ধরে বঞ্চিত হয়েছে। তাই তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করেে

পাশ্চাত্যে জীবন ব্যবস্থা

যদি যেনতেনভাবে যেখানে সেখানে তার যৌন আকাঙ্খা পুরণের অনুমতি দেয়া হতো তাহলে পরিবার প্রথাই চালু হতো না এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতো না। কিন্তু অনেকেই এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে লাগাহীন ও অবাধ যৌন সম্পর্কে জড়াচ্ছেন। বাস্তবতা হচ্ছে যেসব সমাজে যৌন সম্পর্ক উন্মুক্ত এবং লাগামহীন সেখানেই পরিবার ব্যবস্থা দুর্বল। কারণ এ ধরনের সমাজের নারী ও পুরুষেরা যৌন সম্পর্কের জন্য পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না, তারা পরিবার বা বিয়ে বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে জড়াতে দ্বিধাবোধ করেন না।

বিশ্বখ্যাত বই সোশিওলজি বা সমাজবিজ্ঞানের লেখক এন্থনি গিডেন্স নিউজউইক ম্যাগাজিনের বরাত দিয়ে লিখেছেন, ১০ অথবা ২০ বছর ধরে সংসার করেছেন এমন দম্পতির মধ্যেও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটছে এর কারণ হলো নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মনোবৃত্তি। জন্মনিরোধ ট্যাবলেট এবং ফেমিনিজমের যুগে নারীদের অনেকের মধ্যেই এ ধরনের ধারণার জন্ম হয়েছে যে, কামনা-বাসনা পরিবারের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে মার্কিন নারীরা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি ভোগবাদী। এ যুগের মেয়েরা তাদের দাদি-নানিদের চেয়ে অনেক বেশি অসহিষ্ণু।

পাশ্চাত্যে পুরুষদের অনেকেই পরিবার গঠন করেন শুধুমাত্র কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এ কারণে যখনই তার ব্যক্তি জীবন এবং ভোগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় তখনই সে পরিবারকে দূরে ঠেলে দেয়, পরিবার তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

বর্তমানে পাশ্চাত্য-সমাজে যেকোনো উপায়ে আনন্দ উপভোগকে সবকিছুর চেয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়। ভোগের নীতির ভিত্তিতে এসব দেশের আইনকে এমনভাবে তাদের সব ধরণের ইচ্ছা- আকাঙ্খা মেটাতে পারে, চাইলেই পরনারী ও পরপুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তাদের এই নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিরই ফসল হচ্ছে আজকের ভোগবাদী প্রজন্ম। এই প্রজন্ম আগের যে কোন প্রজন্মের চেয়ে অনেক ভোগবাদী ও স্বার্থপর। তারা যেকোনো উপায়ে নিজের চাহিদা মেটানোর পক্ষপাতি। পাশ্চাত্যের সামাজিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন এমন অনেকেই মনে করেন, সেখানে পরিবার প্রথা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ হচ্ছে সব কিছুর আগে নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মানসিকতা। চাহিদা পূরণে ব্যাঘাত ঘটলেই তারা মনে করতে থাকেন পুরো জীবনটাই বৃথা। যেকরেই হোক জীবনকে ভোগ করতে হবে। অন্যের ক্ষতি করে হলেও নিজের চাহিদা পূরণ করতে হবে। এমন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষেরা একবারের জন্যও চিন্তা করেন না বিচ্ছেদের পর তাদের সন্তানদের কী হবে।

আসলে বিবাহবিচ্ছেদের প্রধান শিকার হন সন্তানেরা। তারা বেড়ে ওঠে ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান হিসেবে। যা তাদের স্বাভাবিক মানসিক বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। তারা এক ধরনের 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস' বা পরিচিতি সংকটে ভোগে। মনোচিকিৎসরা মনে করেন, সন্তানরা যদি বাবা-মায়ের স্বাভাবিক সঙ্গ এবং ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তাদের জীবন হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রী যখন কেবল তার নিজের স্বার্থের কথা ভেবে অন্যের জীবনকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয় তখন তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্যে এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে।

বেলজিয়ামে ৭১ শতাংশ বিয়েই শেষ পর্যন্ত তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ গড়ায়। এদিক থেকে বেলজিয়াম গোটা বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে। এরপরেই রয়েছে আরেক ইউরোপীয় দেশ পর্তুগাল। সেখানে তালাকের হার ৬৮ শতাংশ।

এরপরে যথাক্রমে রয়েছে হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, স্পেন, লুক্সেমবুর্গ, স্তোনিয়া, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট। ব্রিটেনেও প্রায় অর্ধেক বিয়ে তালাক গড়ায়। ২০১৯ সালের প্রথম তিন মাসের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ব্রিটেনের ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস রাজ্যে ৪২ শতাংশ দম্পতি বিয়ে বিয়ে টিকিয়ে রাখেনি তারা তালাকে নিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্টের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সেখানে ৫০ শতাংশের বেশি বিয়ে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদে গড়ায়।

পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের করুণ অবস্থা

বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা বিশ্বের সামনে মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, আমাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ ও তাদের শরী'আত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান অর্জন না করে এবং কোনো বাছ-বিচার ও যাচাই বাছাই ছাড়াই পদাঙ্ক অনুসরণ করা। বিশেষ করে নারীদের বেলায় আমরা নির্দ্বিধায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের অনুসরণ করছি, অথচ আমাদের শরী'আত ও তাদের শরী'আতে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। মুসলিমও ও ইসলামী শরী'আত বাদ দিয়ে কোনো সময় এমন কোনো কাজ সমর্থন করতে পারে না, যে কাজে পারিবারিক বন্ধনে ভাঙ্গন বা বিভেগ সৃষ্টি করে । 'আহমদ, হাদীস নং ৫০৪৫।

অথবা নারীর ইজ্জত সম্মানে আঘাত হানে অথবা নারীর মাতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা বিপদকে টেনে আনে।

পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের বেলায় যে সমস্ত আচরণ করা হচ্ছে এবং পুরুষের মতো করে বিনা বাধায় বিনা শর্তে নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে বের করে দেখা হচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় পরিবারকে ভাঙ্গন ও সম্ভ্রমের ওপর আঘাত হেনে তাদের ব্যভিচার ও দেহ-ব্যবসার প্রতি অনুপ্রাণিত করছে। পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের পণ্য হিসেবেই কাজে লাগানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে নেই কোনো সামাজিক বন্ধন এবং নেই কোনো স্নেহ মমতা। পশ্চিমা নারীরা যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন তাদের আর কোনো মূল্যায়ন থাকে না। তারা তখন ঘৃণা ও অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়।

নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যঃ

সমাজে নারী এবং পুরুষ এক নয় এবং এক হতেও পারে না। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা স্বভার, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজন। নারী-পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যও এক নয়। এক মনে করাও ঠিক নয়। বরং উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে পিতৃত্বের ভূমিকা পালন করা, পরিবারের, স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-সন্তান ও অন্য সদস্যদের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আর নারী বা মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা,

সন্তান লালন-পালন ও যথাযথ শান্তি, নিরাপত্তা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা। অতএব, নারী পুরুষের দায়িত্ব এক মনে করার মানেই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

পশ্চিমা বিশ্বে মায়েদের অবস্থাঃ

পশ্চিমা বিশ্বে যারা নারী অধিকারের কথা বলে, সেখানে মায়েদের অবস্থা দেখুন! সেখানে মা-বাবা যেহেতু উভয় চাকরি করেন, সন্তানকে নিজের দুধ পান করাতে পারেন না। নার্সারি বা বেবী সিটার, ডে কেয়ার সেন্টারগুলোতে রেখে দেয়। নিজের প্রথম দিনের বাচ্চাকে নিজের আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত করে। ফলে এ সন্তান প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

মা-বাবা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, সন্তান যেহেতু মায়ের দুধ পান করেনি, কোনো আদর মমতা পায়নি, কোনো বন্ধন সৃষ্টি হয়নি, মায়ের প্রতি তাদের মোটেও মমতা বোধ নেই; তাই মা-বাবা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তাদের ঘর থেকে বের করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়।যখন মা অসুস্থ হয়, সেখান থেকে ফোন আসে আপনার মায়ের ছকপাত-আখেরী অবস্থা।

সে বলে, I am busy today (আজকে ব্যস্ত)। মারা গেলে দাফন করে দাও! কাল এসে বিল পরিশোধ করব। এটাই হলো তাদের সমাজের অবস্থা।

(বি:দ্রঃ লেখাটি একটি বক্তব্যের নির্বাচিত অংশের লিখিত রূপ)

লেখক: সম্পাদক, ত্রৈমাসিক আরবি-ইংরেজি ম্যাগাজিন, 'বালাগুশ শার্ক' ও সিনিয়র শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

যদি যেনতেনভাবে যেখানে সেখানে তার যৌন আকাঙ্খা পুরণের অনুমতি দেয়া হতো তাহলে পরিবার প্রথাই চালু হতো না এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতো না। কিন্তু অনেকেই এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে লাগাহীন ও অবাধ যৌন সম্পর্কে জড়াচ্ছেন। বাস্তবতা হচ্ছে যেসব সমাজে যৌন সম্পর্ক উন্মুক্ত এবং লাগামহীন সেখানেই পরিবার ব্যবস্থা দুর্বল। কারণ এ ধরনের সমাজের নারী ও পুরুষেরা যৌন সম্পর্কের জন্য পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না, তারা পরিবার বা বিয়ে বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে জড়াতে দ্বিধাবোধ করেন না।

বিশ্বখ্যাত বই সোশিওলজি বা সমাজবিজ্ঞানের লেখক এন্থনি গিডেন্স নিউজউইক ম্যাগাজিনের বরাত দিয়ে লিখেছেন, ১০ অথবা ২০ বছর ধরে সংসার করেছেন এমন দম্পতির মধ্যেও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটছে এর কারণ হলো নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মনোবৃত্তি। জন্মনিরোধ ট্যাবলেট এবং ফেমিনিজমের যুগে নারীদের অনেকের মধ্যেই এ ধরনের ধারণার জন্ম হয়েছে যে, কামনা-বাসনা পরিবারের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে মার্কিন নারীরা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি ভোগবাদী। এ যুগের মেয়েরা তাদের দাদি-নানিদের চেয়ে অনেক বেশি অসহিষ্ণু।

পাশ্চাত্যে পুরুষদের অনেকেই পরিবার গঠন করেন শুধুমাত্র কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এ কারণে যখনই তার ব্যক্তি জীবন এবং ভোগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় তখনই সে পরিবারকে দূরে ঠেলে দেয়, পরিবার তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

বর্তমানে পাশ্চাত্য-সমাজে যেকোনো উপায়ে আনন্দ উপভোগকে সবকিছুর চেয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়। ভোগের নীতির ভিত্তিতে এসব দেশের আইনকে এমনভাবে তাদের সব ধরণের ইচ্ছা- আকাঙ্খা মেটাতে পারে, চাইলেই পরনারী ও পরপুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তাদের এই নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিরই ফসল হচ্ছে আজকের ভোগবাদী প্রজন্ম। এই প্রজন্ম আগের যে কোন প্রজন্মের চেয়ে অনেক ভোগবাদী ও স্বার্থপর। তারা যেকোনো উপায়ে নিজের চাহিদা মেটানোর পক্ষপাতি। পাশ্চাত্যের সামাজিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন এমন অনেকেই মনে করেন, সেখানে পরিবার প্রথা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ হচ্ছে সব কিছুর আগে নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মানসিকতা। চাহিদা পূরণে ব্যাঘপাত ঘটলেই তারা মনে করতে থাকেন পুরো জীবনটিই বৃথা। যেকরেই হোক জীবনকে ভোগ করতে হবে। অন্যের ক্ষতি করে হলেও নিজের চাহিদা পূরণ করতে হবে। এমন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষেরা একবারের জন্যও চিন্তা করেন না বিচ্ছেদের পর তাদের সন্তানদের কী হবে।

আসলে বিবাহবিচ্ছেদের প্রধান শিকার হন সন্তানেরা। তারা বেড়ে ওঠে ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান হিসেবে। যা তাদের স্বাভাবিক মানসিক বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। তারা এক ধরনের 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস' বা পরিচিতি সংকটে ভোগে। মনোচিকিৎসরা মনে করেন, সন্তানরা যদি বাবা-মায়ের স্বাভাবিক সঙ্গ এবং ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তাদের জীবন হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রী যখন কেবল তার নিজের স্বার্থের কথা ভেবে অন্যের জীবনকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয় তখন তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্যে এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে।

বেলজিয়ামে ৭১ শতাংশ বিয়েই শেষ পর্যন্ত তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ গড়ায়। এদিক থেকে বেলজিয়াম গোটা বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে। এরপরেই রয়েছে আরেক ইউরোপীয় দেশ পর্তুগাল। সেখানে তালাকের হার ৬৮ শতাংশ। এরপরে যথাক্রমে রয়েছে হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, স্পেন, লুক্সেমবুর্গ, স্তোনিয়া, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট। ব্রিটেনেও

প্রায় অর্ধেক বিয়ে তালাক গড়ায়। ২০১৯ সালের প্রথম তিন মাসের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ব্রিটেনের ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস রাজ্যে ৪২ শতাংশ দম্পতি বিয়ে বিয়ে টিকিয়ে রাখেনি তারা তালাকে নিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্টের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সেখানে ৫০ শতাংশের বেশি বিয়ে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদে গড়ায়।

পশ্চিমা সমাজের অবস্থা হলো, সেখানে যৌন-রোগের ছড়াছড়ি, জীবিত মা-বাবার এতিম সন্তানই বেশি, যুবকদের বিয়ের প্রতি অনীহা, নারী-নির্যাতন বৃদ্ধি, বুড়ো বয়সে আশ্রয়হীন জীবন-যাপন, মাদক সেবন বৃদ্ধি, অ্যালকোহল সেবন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা হ্রাস, অনেক দেশে বিশেষ করে ইউরোপে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। কারণ বিয়ে-শাদি নেই, বিয়ের প্রতি অনীহা, ঘর-বাড়ি বিরাণভূমি, পরিবার নেই, বৈধ সন্তানের চেয়ে জারজ সন্তানের সংখ্যা বেশি। এটা হলো পশ্চিমাদের সমাজের চিত্র।

পশ্চিমা বিশ্বে নারীর বাকস্বাধীনতা : বিশ্বে যারা ভোটাধিকারের কথা বলে, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯২৮ সালের আগে ইংল্যান্ডে নারীরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আমেরিকার মধ্যে নারীরা ১৯২০ সালের আগে ভোট দিতে পারেনি। ইতালিতে ১৯৪৫ সালের আগে নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ সালে, কানাডায় ১৯৪৮ সালে, জাপানে ১৯৪৫ সালে নারীর ভোটাধিকার নিশ্চিত হয়। সূত্র: 'মুতালায়ায়ে সিরাত (সা.)'- লেয়াকত আলী খান নিয়াজি, পৃ. ৩৬৫

দেড়'শ বছর আন্দোলনের পর ১৯৭১ সালে আরমরিকায় নারী আইন পাস হয়। আবার ৮২ সালে ক্যানসেল করে দেওয়া হয়। ৯৪ সালে আবার আইন পাস হয়। আমেরিকান একজন লেখক, গবেষক নারীদের নিয়ে একটি বই লিখেছেন। বইয়ের নাম " women in the work place"(চাকরির স্থানে নারী)। তিনি এ বইয়ের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের নারীদের করুন অবস্থা তুলে ধরেছেন যে আমাদের দেশে দরিদ্র হলো নারী, তাদের মধ্যে মানসিক রোগ ধরা পড়েছে এবং নারীরা সব জায়গায় নিগ্রহ-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এক জরিপে দেখা যায়, ১৯৯৮ সালে আমেরিকায় ৪০ মিলিয়ন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নারী তার স্বামী, প্রাক্তন স্বামী ও বয়-ফ্রেন্ডের হাতে নির্যাতিত হয়েছে।

some of the costs of the sex gender system. The poverty of women and children, the double day, high rates of mental illness (especially depression) among women, women battering and rape (women in the work place by Richardson)

তারা নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত এবং বহু দিন ধরে বঞ্চিত হয়েছে। তাই তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করেছে।

ইউরোপে নারীর প্রতি সহিংসতা

ইউরোপীয় মহিলাদের বিকাশ এবং ইতিহাস ইউরোপের উন্নয়ন এবং ইতিহাসের সাথে মিলে যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জনসংখ্যার প্রায় ৫১.২% নারী (২০১১ সালে জানুয়ারী আদমশুমারি অনুযায়ী ইইউ এর জনসংখ্যার সংখ্যা ৫০২.১২২৫ মিলিয়ন)।

বর্তমান যুগে শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে, তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা ইউরোপীয় মহাদেশে বাস করে, অথবা সেখানে জন্মগ্রহণ করেছে, অথবা মহাদেশের আদি বাসিন্দা।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৮ টি দেশের ৪২ হাজার নারীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে "ইইউ এজেন্সি ফর ফান্ডামেন্টাল রাইটস" (এফআরএ) প্রতিবেদন তৈরি করে। এতে দেখা যায়, এসব দেশে প্রতি তিনজনে একজন নারী ১৫ বছর থেকে শুরু করে কোনো না কোন যৌন নিপীড়ন এর শিকার হয়েচে। আার প্রতি ২০ জনে একজন নারী ধর্ষিত হন। প্রতি ১০ জনে একজন নারীরি পিছু ধাওয়া করে তাকে উত্যক্ত করেন সাবেক স্বামী বা প্রেমিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বর্তমান বা সাবেক সঙ্গীর দ্বারা এমন সহিংসতার ঘটনার শিকার হন নারীরা। আর সম্পর্ক থাকাকালেই নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ২২ শতাংশ নারী। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৩১ শাতংশ জানিয়েছেন, সঙ্গীর দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন তারা। মাত্র ১৪ শতাংশ নারী সঙ্গীর দ্বারা ভয়াবহ নিপীড়নের কথা পুলিশকে জানিয়েছেন। আর মাত্র ১৩ শতাংশ নারী সঙ্গী নন এমন কারও দ্বারা গুরুতর নিপীড়নের বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন। প্রতি ১০ জনে একজন নারী ১৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরষের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এসব দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডেনমার্কে প্রায় ৫২ শতাংশ। এরপর রয়েছে যথাক্রমে ফিনল্যান্ডে, ৪৭ শতাংশ এবং সুইডেনে ৪৬ শতাংশ। যুগ্মভাবে এ তালিকায় শীষ পঞ্চমে আছে যুক্তরাজ্য। দেশটিতে নারীর প্রতি এমন সহিংসতার হার ৪৪ শতাংশ। আর এ তালিকায় দেখা গেছে নারীর প্রতি সবচেয়ে কম সহিংসতা ঘটেছে পোল্যান্ডে ১৯ শতাংশ।

মুসলিম নারী বনাম পাশ্চাত্য নারী

পশ্চিমা নারীরা তাদের মত চলুক, তাদের পুরুষরা তাদের জন্য যেটা কল্যাণকর মনে করে সেভাবেই চলুক। যাদের জীবনে আখেরাত-ভাবনা বলে কিছু নেই তাদের লাইফস্টাইল। মুসলিম নারীরাই শ্রেষ্ঠ; যতক্ষণ তারা হেজাবের পাবন্দী করবে, ইসলামের আদাবের প্রতি গুরুত্ব দিবে, আরবের স্বভাব-চরিত্র আর ইসলামের আহকামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং ঐ সমাজের রীতি-নীতি আপন করে নিবে, সেই নারীর মর্যাদা ততগুণ বৃদ্ধি

পাবে। মুসলিম নারীরা নিজ গৃহে অবস্থান করে আর পুরুষেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা করে।

একজন মুসলিম নারী যখন বিবাহের বয়সে উপনীত হয় তখন পুরুষ তার জন্য প্রস্তাব পাঠায় এবং তার পর্যন্ত পৌঁছতে মোটা অংকের মোহর পরিশোধ করে। স্বামী প্রদত্ত এ সম্পদ নারীর একার, এর একমাত্র মালিক সে। এতে তার অনুমতি ব্যতীত আপন পিতা, ভাই বা স্বামী কারো হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার নেই। আর পশ্চিমা নারী! তার নিজেকেই ছুটতে হয় পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে। তারপর ঐ পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছাতে তাকে পঞ্চাশ হোঁচট খেতে হয়। কখনো কখনো এমন তব্রি হোঁচট খায় যে, এক হোঁচটেই সবকিছু খোয়াতে হয়, এমনকি জীবনটা পর্যন্ত! এতকিছুর পর যদিওবা তার পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাকে গুণতে হয় মোটা অংকের অর্থ। যেন স্ত্রী স্বামীকে মোহর দিয়ে বিবাহ করছে! এরপর থাকলো স্ত্রীর সম্পদ। সেখানেও তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চলবে না। স্বামীও হস্তক্ষেপ করবে তার সম্পদে। আর মুসলিম নারীর সম্পদ! একমাত্র তার, কারো হস্তক্ষেপ চলবে না তার সম্পদে।

বিবাহ তো আজীবনের বন্ধন। নারী-পুরুষ সে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর মাধ্যমে তারা তাদের বিশেষ চাহিদা পূরণ করে। আর সেটিই বিবাহের প্রথম আকর্ষণ।

আজ পশ্চিমা নারী বিবাহের মত পবিত্র বন্ধন থেকে বঞ্চিত। ফলে সে হারিয়েছে পরিবার ও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্বশীলকে বঞ্চিত হয়েছে জীবিকার নিরাপত্তা থেকে, মাথার উপরের নিরাপদ ছায়া থেকে। ফলে জীবন ধারণের জন্য সে গ্রহণ করেছে সব ধরণের পেশা, হীন থেকে হীনতার কাজ।

পাশ্চাত্যে নারীকে অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার বা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করার কারণে অর্থনৈতিক অঙ্গনে তারা প্রবেশ করলেও বা ভূমিকা রাখলেও নানাভাবে নারীরা শোষণের শিকার হচ্ছে।

বর্তমানেও বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে পাশ্চাত্যে নারীদের দুরবস্থার বিষয়টি ফুটে ওঠে। গত এক দশক ধরে দশটি দেশের মধ্যে নারীদের নিরাপত্তাহীনতার দিক থেকে আমেরিকার অবস্থান শীর্ষে। পাশ্চাত্যে নারীদের অধিকার মেনে চলার যে দাবি করা হয় তা একেবারেই প্রতারণাপূর্ণ। পাশ্চাত্যে নৈতিকতার চরম অধঃপতন ঘটেছে যার শীর্ষে রয়েছে আমেরিকা এবং নারীদের প্রতি ব্যাপক জুলুম ও বৈষম্য করা হয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে প্রতি বছর লাখ লাখ নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী মহানবী (সা.) এর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা সালামুল্লা আলাইহার পবিত্র জন্মদিন উপলক্ষে গতকাল (বুধবার) রাজধানীর তেহরানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ নেতা একদল নারীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে পাশ্চাত্যে নারীদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি

বলেন, পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায় মানুষের মর্যাদা পুঁজির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় এবং পুরুষরা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হওয়ায় নারীর উপর পুরুষরা অগ্রাধিকার পাচ্ছে। কম মজুরিতে কারখানায় নারীদের ব্যবহার করার জন্য পশ্চিমে নারী স্বাধীনতার বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি মানবতার চেয়ে উচ্চতর এবং মানুষের মানবতা পুঁজির সেবায়। তাই যে বেশি পুঁজি সঞ্চয় করতে পারে সে আরও মূল্যবান। তিনি বলেন, পশ্চিমারা যখন নারীর অধিকারের ব্যাপারে নিজেদেরকে অগ্রপথিক বলে উপস্থাপন করে তখন তা চূড়ান্ত লজ্জা বলে পরিগণিত হয়। বরং এর বিপরীতে আসল সত্য হচ্ছে- পশ্চিমা দেশগওলো বিভিন্নভারে নারীর মর্যাদা বিনষ্ট করেছে এবং নারীর অধিকার ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তারাই দায়ী। নারীর অধিকারের পক্ষে পশ্চিমাদের ওকালতি চরম পর্যায়ের নির্লজ্জতা।

ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব

❐ পরিবারের সংজ্ঞাঃ

কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে পরিবার বুঝতে 'আল' (آل), 'আহল' (أهل) ও 'ইয়াল' (عيال) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। 'আল-মু'জামুল ওয়াসীত' অভিধানে বলা হয়েছে, آل الرجل : أهله و عياله কোন ব্যক্তির 'আল' হচ্ছে তার পরিবার-পরিজন, الأهل : الأقارب و العشيرة والزوجة অর্থাৎ الأهل হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রী, العيل অর্থ হচ্ছে عيل الرجل : أهل بيته الذين يكفلهم কোন ব্যক্তির ঘরের ঐ সকল অধিবাসী যাদের দায়-দায়িত্ব ঐ ব্যক্তি বহন করে।[৩] আরবীতে 'আল-উসরাহ' বলতেও পরিবার বুঝায়। ড. মাহমুদ আবদুর রহমান আব্দুল মুনঈম বলেন, الأسرة : عشيره الرجل و أهل بيته "ব্যক্তির পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দেরকে পরিবার বলে।"[৪]

পরিবারের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে 'আল-ফিকহুল মানহাজী' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

ويقصد بالأُسرة اصطلاحا في نظام الإسلام تلك الخليّة التي تضم الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والبنات والأبناء، وأبناء الأبناء

"ইসলামের দৃষ্টিতে পারিভাষিক অর্থে পরিবার বলতে বুঝায় বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের নিয়ে গঠিত জনসমষ্টিকে।"[৫]

❐ ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব

ইসলাম পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল করার জন্য নানাবিধ বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে, যেগুলো পরিবারের প্রতি ইসলামের সীমাহীন গুরুত্বরোপের প্রমাণবাহী। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের (সাল্লল্লাহু আলাইতি ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমে এসব বিধি-বিধান মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। Dr. Shawqi dayf বলেন, The Family and Marriage গ্রন্থে বলা হয়েছে:

One of the oldest among human institutions, the family, is also the most resilient.[২]

মানব জীবনের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। ব্যক্তি পরিবারের একটা অংশ। আর পরিবার সমাজের অংশ ও ভিত্তিপ্রস্তর। সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না, তেমনি পরিবার ছাড়া সমাজও অকল্পনীয়। পরিবার ঠিক হলে ব্যক্তি ঠিক হয়ে যায়। আর ব্যক্তি ঠিক হয়ে গেলে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ঠিক হয়ে যায়। সুখে-সমৃদ্ধিতে গড়ে ওঠি সর্বাঙ্গীন সুন্দর এক সমাচ কাঠামো। এজন্য ইসলাম পারিবারিক জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্বের বাথে বিবেচনা করেছে এবং কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধানের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে পরিবার।

❐ সমাজব্যবস্থার ভিত্তি

"দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একই বংশোদ্ভূত" - এ মতের উপরই ইসলামী সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম একজোড়া মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারপরে সেই জোড়া হতে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য হয়েছে। প্রথম দিক দিয়ে একজোড়া মানুষের সন্তানগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত একই দল ও একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি একই প্রকারের ছিল; তাদের ভাষাও ছিল এক। কোনো প্রকার বিরোধ-বৈষম্য তাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই তারা পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং এ বিস্তৃতির ফলে তারা অতি স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বংশ, জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তাদের ভাষা বিভিন্ন হয়ে গেল, পোশাক-পরিচ্ছেদের দিক দিয়ে অনেক বৈষম্য ও বৈচিত্র দেখা দিল। দৈনন্দিন জীবনযাপনের রীতিনীতিও আলাদা হয়ে গেল এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আবহাওয়ায় তাদের রং, রূপ ও আকার-আকৃতি পর্যন্ত বদলিয়ে গেল। এসব পার্থক্য একেবারেই স্বাভাবিক, বাস্তব দুনিয়ায়ই এটা বর্তমান। কাজেই ইসলামও এসবকে ঠিক একটা বাস্তব ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে। ইসলাম এসবকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পক্ষপাতি নয়, বরং এসবের দ্বারা মানব সমাজে পারস্পরিক পরিচয় লাভ করা যায় বলে ইসলাম এগুলোকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু পার্থক্য-বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে মানব সমাজে বর্ণ, বংশ, ভাষা, জাতীয়তা এবং স্বাদেশীকতার যে হিংসা- দ্বেষ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না, এর দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণরূপেই ভুল। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে শুধু জন্মের ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ, আশরাফ-আতরাফ এবং আপন-পরের যে পার্থক্য করা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা একেবারেই জাহেলিয়াত, একেবারেই

মূর্খতাব্যঞ্জক। ইসলাম সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে সম্বোধন করে বলে যে, তোমরা সকলেই এক মাতা ও এক পিতার সন্তান, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই এবং মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে তোমরা সকলেই সমান ।

ইসলামী সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ

মানব সমাজের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। একজন পুরুষ ও একজন নারী, পারস্পরিক মিলনের ফলেই হয় এ পরিবারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এ মিলনের ফল স্বরূপ এক নতুন বংশের সৃষ্টি হয়। তারপর সেসব সন্তানের দিক দিয়ে নতুন আত্মীয়তা, সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্বের একটা স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়। আর সবশেষে এ জিনিসই ছড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে একটি বিরাট সমাজের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাকে কেন্দ্র করে একটি বংশ এর অধস্তন পুরুষকে মানব সভ্যতার বিপুল দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষ স্নেহ, ত্যাগ, হৃদয়ের গভীর ভালবাসা ও দরদ এবং হিতাকাঙ্খা সহকারে তৈরী করতে পারে। এ প্রতিষ্ঠান মানব সভ্যতার স্থায়িত্ব এবং ক্রমোন্নতির জন্য নতুন লোকের কেবল জন্ম দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং এর কার্যচারীগণ যে মনে প্রাণে এটাই কামনা করে যে, তাদের স্থান দখল করার জন্য যে নতুন মানুষের জন্ম হচ্ছে তারা তাদের চেয়েও উপযুক্ত হোক। এ দিক দিয়ে এ তত্ত্ব কথায় কোনো সংশয় থাকে না যে, পরিবারই হচ্ছে মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি। আর এ মূল ভিত্তির সুস্থতা ও শক্তির উপর স্বয়ং তামাদ্দুনের সুস্থতা ও শক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে। এজন্যেই ইসলাম সর্বপ্রথম এ পরিবার প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর শুদ্ধ ও মযবুত বুনিয়াদের উপর স্থাপন করার দিকে বিশেষ লক্ষ আরোপ করেছে।

❐ আত্মীয়তার সীমা

পরিবারের সংকীর্ণ পরিধির বাইরে আত্মীয়তাই হচ্ছে নিকটবর্তী সীমান্ত । এর পরিধি বহু প্রশস্ত হয়ে থাকে। যারা মা-বাপের সম্পর্ক কিংবা ভাই- ভগ্নির সম্পর্ক, অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে একে অন্যের আত্মীয় হবে ইসলাম তাদের পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, সাহায্যকারী ও দয়াশীল দেখতে চায়। কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় নিকটাত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করার আদেশ দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও এর 'হক' আদায় করার জন্য বার বার তাকীদ এসেছে এবং এটাকে একটা বড় পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করেছে। যে ব্যক্তি নিজ আত্মীয়দের সাথে মনোমালিন্য, কপটতা ও তিক্ততাপূর্ণ ব্যবহার

করবে, ইসলাম তাকে মোটেই ভাল চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু তাই বলে আত্মীয়-স্বজনের অনাহুত পক্ষপাতিত্ব করাও ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো সৎকাজ নয়, নিজ পরিবার ও গোত্রের লোকদের অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা ইসলামের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ। এরূপ কোনো সরকারী অফিসার যদি জনগণের অর্থ দ্বারা নিজ লোকদের প্রতিপালন করতে শুরু করে, কিংবা কোনো বিষয়ের বিচারের বেলায় তাদের প্রতি অকারণে পক্ষপাতিত্ব করে তবে মনে রাখতে হবে যে, এটা একটি শয়তানী অপরাধ । ইসলাম যে আত্মীয়তা রক্ষা করার আদেশ দেয়, তা নিজের দিক দিয়ে এবং হক ও ইনসাফের সীমার মধ্যে থেকে হওয়া চাই।

❐ প্রতিবেশীর অধিকার

আত্মীয়তার সম্পর্কের পর দ্বিতীয় নিকটবর্তী হচ্ছে প্রতিবেশীর সম্পর্ক। কুরআনের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী তিন প্রকার। প্রথমত আত্মীয় প্রতিবেশী, দ্বিতীয় অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং তৃতীয় অস্থায়ী প্রতিবেশী - অল্পকালের জন্য যার সাথে উঠা-বসা ও চলা-ফেরা করার সুযোগ হয়েছে, ইসলামের সমাজ- বিধান অনুযায়ী এরা প্রত্যেকেই বন্ধুত্ব, সহানুভূতি এবং ভাল ব্যবহার পাবার অধিকারী। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সা. বলেছেন, প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করার জন্য আমাকে এতদূর তাকীদ দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার দেয়া যেতে পারে বলে আমার ধারণা হচ্ছিল। একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ সা. বলেছেন : প্রতিবেশীর সাথে যে ব্যক্তি ভাল ব্যবহার করবে না, সে প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার নয়। অন্য একটি হাদীসে নবী সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি পেট ভরে আহার করবে এবং তারই পাশে তার প্রতিবেশী উপবাস থাকবে মনে করতে হবে সে ব্যক্তির ঈমান নেই। একবার হযরত নবী সা.-এর নিকট নিবেদন করা হয়েছিল যে, একটি মেয়েলোক খুব বেশী নফল সালাত আদায় করে, প্রায়ই সওম রেখে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে দান-খয়রাত করে থাকে ; কিন্তু তার কটূক্তিতে তার প্রতিবেশী ভয়ানক নাজেহাল। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। উপস্থিত লোকেরা নিবেদন করল, অন্য একটি মেয়েলোক এমন আছে, যার মধ্যে এ ধরনের ডাল গুণ অবশ্য নেই ; কিন্তু প্রতিবেশীকে সে কষ্ট দেয় না। হযরত নবী করীম সা. বললেন.. সে জান্নাতী হবে করীম সা. লোকদের বিশেষ তাকীদ করে বলেছেন যে, নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য কোনো ফল কিনে আনলে যে, একটি মেয়েলোক খুব বেশী নফল সালাত আদায় করে, প্রায়ই সপ্তম রেখে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে দান-খয়রাত করে থাকে ; কিন্তু তার কটূক্তিতে তার প্রতিবেশী ভয়ানক নাজেহাল। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। উপস্থিত লোকেরা নিবেদন করল, অন্য একটি মেয়েলোক এমন আছে, যার মধ্যে এ ধরনের ভাল গুণ অবশ্য নেই ; কিন্তু প্রতিবেশীকে সে কষ্ট দেয় না। হযরত নবী করীম সা. বললেনঃ সে জান্নাতী হবে। নবী করীম সা. লোকদের বিশেষ তাকীদ করে বলেছেন যে, নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য কোনো ফল কিনে আনলে তার কিছু অংশ তোমার প্রতিবেশীর ঘরে অবশ্যই পাঠাইও, নতুবা ফলের খোসা বাইরে

নিক্ষেপ করো না, কারণ এটা দেখে গরীব প্রতিবেশীর মনে দুঃখ জাগতে পারে। নবী করীম সা. বলেছেন : তোমার প্রতিবেশী যদি তোমাকে ভাল তবে তুমি নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু তোমার সম্পর্কে তোমার প্রতিবেশীর মত যদি খারাপ হয়, তবে তুমি একজন খারাপ লোক তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। মোটকথা, যারা একে অপরের প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করছে, ইসলাম সেসব লোককে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, সাহায্যকারী ও সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে দেখতে চায়। ইসলাম তাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় যে, তারা যে একজন অপরজনের উপর নির্ভর করতে পারে এবং একজন অপরজনের সাহায্যে নিজের জান-মাল ও সম্মানকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারে। কিন্তু যেসব সমাজে একটা দেয়ালের দু-দিকে অবস্থিত দু-ঘরের অধিবাসী দু-জন মানুষ পরস্পর চিরদিন অপরিচিত থাকে এবং যে সমাজে এক গ্রামের অধিবাসীর মধ্যে পারস্পরিক কোনো সহানুভূতি, কোনো সহৃদয়তা ও নির্ভরতা নেই সেসব সমাজ কখনো ইসলামী সমাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

❐ পরিবারের অপরিহার্যতা

" মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারের মধ্যেই হয় মানুষের এ সামাজিক জীবনের সূচনা। মানুষ সকল যুগে ও সকল কালেই কোনো না কোনোভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীনতম কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা প্রথম স্তর হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সোজা কথায় বলা যায়, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের যে গুরুত্ব, প্রাচীনতম কালে - মানুষের প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা শুরু হয়েছিল, মানবতার সেই আদিম শৈশবকালে পরিবার ছিল সেই গুরুত্বের অধিকারী । বংশ ও পরিবার সংরক্ষণ এবং তার সাহায্য সহায়তার লক্ষ্যে দুনিয়ার বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনও চিরকাল সুনাম-সুখ্যাতি ও গৌরবের বিষয়রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। আর নীচ বংশে ও নিকৃষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ বা আত্মীয়তা লাভ মানুষের হীনতা ও কলংকের চিহ্নরূপে গণ্য হয়েছে চিরকাল। যে-ব্যক্তি নিজ পরিবারের হেফাযত, উন্নতি বিধান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে, সে চিরকালই বংশের গৌরব - Hero রূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে পরিবারস্থ প্রত্যেকটি মানুষের নিকট।

❐ পরিবারের ভিত্তি

প্রাচীনকাল থেকেই পরিবার দু'ট ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়ে এসেছে। একটি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি-নিহিত স্বভাবজাত প্রবণতা। এই প্রবণতার কারণেই মানুষ চিরকাল পরিবার গঠন করতে ও পারিবারিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং পরিবারহীন জীবনে মানুষ অনুভব করেছে বিরাট শূন্যতা ও জীবনের চরম অসম্পূর্ণতা। পরিবারহীন মানুষ নোঙরহীন নৌকা বা বৃত্তচ্যুত পত্রের মতোই স্থিতিহীন।

আর দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে সমসাময়িককালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় পরিবার ছিল বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র। সমাজ ও জাতি গঠনের জন্যে তা-ই ছিল একমাত্র উপায়। এ কারণে প্রাচীনকালের গোত্র ছিল অধিকতর প্রশস্ত; এতদূর প্রশস্ত যে, নামমাত্র রক্তের সম্পর্কেও বহু ব্যক্তি এক-একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারত। এমন কি বাইরে থেকে যে লোকটিকে পরিবারের মধ্যে শামিল করে নেয়া হতো, তাকেও সকলেই উক্ত পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে নিত। পরিবারের নিজস্ব একান্ত আপন লোকদের জান-মাল ও ইযযতের যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো, সেই বাইরে থেকে আসা লোকটিরও হেফাযত করা হতো অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে। ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে 'মুতাবান্না'- পালিত পুত্র গ্রহণের রীতি ছিল, একথা সর্বজনবিদিত। ইউরোপে এই সেদিন পর্যন্তও পালিত পুত্রকে আইন সম্মতভাবেই বংশোদ্ভূত সন্তানের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা হতো। রোমান সভ্যতার ইতিহাস এর চেয়েও অগ্রসর। সেখানে অন্ত-জানোয়ারকে পর্যন্ত পরিবারের অংশ বলে মনে করা হতো; মর্যাদা তার যত কমই হোক না কেন। এ থেকে এ সত্য জানতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিবারের পরিধি অধিকতর প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল।

সেকালে জীবন-জীবিকার বেশির ভাগই নির্ভরশীল ছিল চতুষ্পদ জন্তু ও কৃষি উৎপাদনের ওপর। এজন্যে প্রত্যেকটি পরিবারই এক বিশেষ ভূখণ্ডের ওপর প্রাচীর নির্মাণ করে নিজেদের এলাকা নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত করে রাখত। সে সীমার মধ্যে অপর কোনো পরিবারের লোক বা জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারত না। এর ফলে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি ছিল তাদের নিত্যনৈতিক ব্যাপার। আর তাগের বিশেষ কোন স্থানে একত্রিত ও সম্মিলিত হওয়ার মতো কেন্দ্র বলতে কিছুই ছিলনা। তাদের মধ্যে ঐক্যের কোন সূত্র বর্তমান থাকলেও উপায় উপাদানের অভাব ও গ্রোত্রীয় রাজনীতির জাত-প্রকৃতি এদিকে অগ্রসর হওয়ার পথে কঠিন বাঁধা হয়ে দাঁড়াত। এমনকি এক ভৌগলিক এলাকার মধ্যে যে-সব গোত্র বাস করত এবং যাদের মধ্যে করা হতো; মর্যাদা তার যত কমই হোক না কেন। এ থেকে এ সত্য জানতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিবারের পরিধি অধিকতর প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল।

সেকালে জীবন-জীবিকার বেশির ভাগই নির্ভরশীল ছিল চতুষ্পদ জন্তু ও কৃষি উৎপাদনের ওপর। এজনো প্রত্যেকটি পরিবারই এক বিশেষ ভূখণ্ডের ওপর প্রাচীর নির্মাণ করে নিজেদের এলাকা নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত করে রাখত। সে সীমার মধ্যে অপর কোনো পরিবারের লোক বা জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারত না। এর ফলে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি 'হওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আর তাদের বিশেষ কোনো স্থানে একত্রিত ও সম্মিলিত হওয়ার মতো কেন্দ্র বলতে কিছুই ছিল না। তাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো সূত্র বর্তমান থাকলেও উপায়-উপাদানের অভাব ও গোত্রীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এদিকে অগ্রসর হওয়ার পথে কঠিন বাঁধা হয়ে দাঁড়াত। এমনকি এক ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে যে-সব গোত্র বাস করত এবং যাদের মধ্যে জীবনের মূল্যমান ছিল এক ও অভিন্ন, তারাও পরস্পরের শত্রু এবং যুধ্যমান ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামশীল

হয়ে থাকত। প্রতিটি গোত্র অপর গোত্রকে চরম শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখত, পরস্পরের ক্ষতি সাধনের জন্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টাই তারা চালাত। মানবতার এই প্রাথমিক স্তরে নিজেও নিজ পরিবার-গোরোর সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে কোনো বিষয় ও সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও সম্ভব হত না কারো পক্ষে। আর চিন্তা ও কর্মের শত-সহস্র যোজন পার হয়ে আসার পর আজ মানুষও পারছে না আন্তর্জাতিক ও বিশাল মানবতার দৃষ্টিতে চিন্তা করার অভ্যাস করতে।

মানুষের নিকট নিজের জান ও মাল চিরকালই অভ্যস্ত প্রিয় সম্পদ। এসবের জন্যেই মানুষ চেষ্টা ও করত; সকল প্রকার বিপদ ও ঝুঁকির মুকাবিলা করত এবং তার সংরক্ষণের জন্যে সম্ভাব্য সকল রক্ষা-ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতো। তাদের প্রিয় জান-প্রাণ সুরক্ষিত রাখার সব উপায় ও পথ অবলম্বন করা হতো। আর এভাবেই তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন-জীবিকার দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষিত হতো।

মানুষ যখন দেখতে পায় যে, তার জান ও মালের সংরক্ষণ তার পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিপদ-মুসিবতে ভারাক্রান্ত সমগ্র পরিবেশের মধ্যে তার পরিবারই হচ্ছে তার একমাত্র আশ্রয়- এ পরিবারই তাকে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করছে, শত্রুদের মুকাবিলায় সব সময়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, তার দুঃখ-দরদ ও বিপদ-মুসিবতের বেলায় তার সাথে সমানভাবে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তখন তার পক্ষে পরিবারের সাথে পূর্ণমাত্রায় জড়িত ও একাত্ম হয়ে থাকাই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

❐ সমাজ পরিসরে পরিবারের গুরুত্ব

পরিবার গঠন ও রূপায়ণ এবং তার সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলার আগে একটি মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে হবে; আর তা হচ্ছে সমাজ ও সামাজিক জীবনের সাফল্যের জন্যে পরিবার কি সত্যই অপরিহার্য । সুষ্ঠু রীতি-নীতির ভিত্তিতে পরিবার গঠন না করে সামগ্রিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া কি সমাজের পক্ষে- সমাজের ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব । পারিবারিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের সমস্যা কি আমাদের জীবনে এতই গভীর ও জটিল যে, তাকে উপেক্ষা করলে জীবন মহাশূন্যতায় ভরে যাবে । ..... কিংবা এ বিষয়গুলো তেমন গুরুতর কিছু নয়; এবং সহজেই তাকে উপেক্ষা করা চলে। পরিবার ভেঙ্গে দেয়ার পর রাষ্ট্র ও সরকার কি সুষ্ঠু সামাজিক জীবন গঠনের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারবে ?

যেহেতু সমাজের উন্নতি কিংবা পতনের ব্যাপারে পরিবার ও পারিবারিক জীবন যদি সত্যিই কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে তা নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন। আর যদি সমাজের সাফল্য ও সামাজিক জীবনের কল্যাণ লাভের ওপর নির্ভরশীলই হয়ে থাকে, তাহলে তাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করা গোটা সমাজের পক্ষেই মারাত্মক। কাজেই প্রশ্নটির জবাব নির্ধারণের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী- স্বামী ও স্ত্রী- সঠিক মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ ও এ প্রশ্নের জবাবের ওপরই নির্ভরশীল।

❐ মানব জীবনের লক্ষ্য

শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভই হচ্ছে মনব-জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, মানব মনের ঐকান্তিক কামনা ও বাসনা। এদিক দিয়ে সব মানুষই সমান। উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, গরীব-ধনী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামবাসী-শহরবাসী এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে এদিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। সিংহাসনারূপ বাদশাহ আর ছিন্নবস্ত্র পরিহিত দীনাতিদীন কুলি-মজুর সমানভাবে দিন-রাত্রি এ উদ্দেশ্যেই কর্ম নিরত হয়ে রয়েছে। কর্মপ্রেরণার এ হচ্ছে উৎসব। এ জিনিস যদি কেউ সত্যিই লাভ করতে পারে তাহলে মনে করতে হবে, সে জীবনের সবচাইতে - মূল্যবান সম্পদ লাভ করেছে। তার জীবন সত্যিকারভাবে সাফল্য ও চরম কল্যাণ লাভে ধন্য হয়েছে।

❐ নারী ও পুরুষ

সমাজের নারী এ সম্পদ লাভ করতে পারে একমাত্র পুরুষের নিকট থেকে, আর পুরুষ তা পেতে পারে কেবল মাত্র নারীর নিকট থেকে। দুই ব্যক্তির পারস্পরিক বন্ধুত্ব-ভালোবাসা, দুই সঙ্গীর দুই পথিকের মতৈক্য, দুই জভির মৈত্রীবন্ধন, ব্যক্তির মনে তার মতবাদ-বিশ্বাসের প্রতি প্রেম, পেশা ও শিল্পের প্রতি মনোযোগিতা প্রভৃতি যে সব জিনিস জীবন সংগঠনের জন্যে অত্যন্ত জরুরী এর কোনটিই মানুষকে সে শান্তি, সুখ ও নিবিড়তা-নিরবচ্ছিন্নতা দান করতে পারে না, যা লাভ করে নারী পুরুষের কাছ থেকে এবং পুরুষ নারীর নিকট থেকে। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে অতি স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক অতীব গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান। এ আকর্ষণ চুম্বকের চাইতেও তীব্র। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একজন অপরজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রত্যেকেই নিজের সে হারানো সম্পদ অপর জনের নিকট লাভ করে, যার জন্যে সে অনন্তকাল ধরে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে অতন্দ্র প্রতিক্ষায় উন্মুখ হয়ে কাটিয়েছে যুগের পর যুগ। প্রত্যেক নারীর মধ্যে পুরুষের জন্যে অপরিসীম ভালোবাসা ও আবেগ উদ্বেলিত প্রেম-প্রীতির অফুরন্ত ভাণ্ডার সিঞ্চিত হয়ে আছে। তেমনি আছে প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে স্ত্রীর জন্য। এ এমন এক মহামূল্য নেয়ামত, যার তুলনা এই বিশ্ব প্রকৃতির বুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

❐ সুখ-দুঃখের সাথী

এ দুনিয়া এক বিরাট-বিশাল কর্মক্ষেত্র। এখানে বসবাসের জন্যে গতি, কর্মোদ্যম ও তৎপরতা-একাগ্রতা একান্তই প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে মানুষ কখনো আনন্দ লাভ করে, কখনো হয় দুঃখ-ব্যথা-বেদনার সম্মুখীন। আর মানুষ যেহেতু অতি সূক্ষ্ম ও অনুভূতিসম্পন্ন সেজন্যে আনন্দ কিংবা দুঃখ তাকে তীব্রভাবে প্রভাবান্বিত করে। ফলে তার প্রয়োজন হচ্ছে সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম সঙ্গী ও সাথীর, যেন তার আনন্দে সে-ও সমান আনন্দ লাভ করে আর তার দুঃখ-বিপদেও যেন সে হয় সমান অংশীদার। নারী কিংবা পুরুষ উভয়ই এ দিক দিয়ে সমান অভাবী। প্রত্যেকেরই

সঙ্গী ও সাথীর প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে নারীই হতে পারে পুরুষের সতি ¨ কার দরদী বন্ধু ও খাঁটি জীবন-সঙ্গিনী। আর পুরুষ হতে পারে নারীর প্রকৃত সহযাত্রী, একান্ত নির্ভরযোগ্য ও পরম সান্ত্বনা বিধায়ক আশ্রয়।

❒ স্থায়ী সম্পর্ক

মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখের এ আবর্তন সব সময়ই ঘটতে পারে- ঘটে থাকে। ফলে তার প্রয়োজন এমন সঙ্গী ও সাথীর, যে সব সময়ই জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল সময় ও সব রকমের অবস্থায়ই তার সহচর হয়ে থাকবে ছায়ার মতো এবং অকৃত্রিক বন্ধু হিসেবে করবে সব দায়িত্ব পালন । মানুষের জীবনব্যাপী সংগ্রাম অভিযানের ক্ষেত্রে এ এক স্থায়ী, মৌলিক ও অপরিহার্য প্রয়োজন ।

এ প্রয়োজন পূরণের জন্যেই নারী ও পুরুষের মাঝে স্থায়ী বন্ধন সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ই জীবনের তরে পস্পরের সাথে যুক্ত হতে পারে, যুক্ত হয়ে থাকে। আজীবন এ বন্ধনের সুযোগেই নারী ও পুরুষের প্রধান সার্থক হতে পারে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে কার্যকর। বিয়ের বন্ধনই হচ্ছে এর অকাট্য দৃঢ় সূত্র । এ বন্ধন ব্যতীত আর কোনো প্রকার অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

❒ পারিবারিক জীবনে সন্তানের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের পান। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِيْنَ وَحَفَدَةً ''আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এই জুড়ি থেকেই তোমাদের জন্যে সন্তান-সতি ও পৌত্র-পৌত্রী বানিয়ে দিয়েছে। বস্তুত সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র নিজস্ব দান বৈ কিছু নয়।''

আল্লামা শাওকানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

المعنى خلق لكم من حنسكم ازواجا لتستا نسوابها لان الجنس يانس الى جنسه و يتوحش من غير جنسه و سبب هذه النسية يقع بين الرجال والنساء ما هو سبب للنسل الذى هو مقصود بالزواج-

এ আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতির মধ্য থেকেই জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর সাথে অন্তরের গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হতে পারো। কেননা প্রত্যেক প্রজাতিই তার স্বজাতির প্রতি মনের আকর্ষণ বোধ করে আর ভিন্ন প্রজাতি থেকে তার মন থাকে বিরূপ। মনের এ আকর্ষণের কারণেই স্ত্রী-পুরুষের মাঝে এমন সম্পর্ক স্থাপিত ও কার্যকর হয়, যার ফলে বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে, আর তাই হচ্ছে বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য।

বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসা পরিণতি ও পরিপূর্ণতা লাভ করে এ সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। সন্তানাদি সম্পর্কে কুরআন মজীদে আরো বলা হয়েছে,

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ''ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন''। আল্লাম আলুসী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, اَلْمَالُ : مناط لبقاء النفس والبنون لبقاء النوع 'ধন-মান হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম।

বস্তুত দুনিয়ায় কত সহস্র মানুষ এমন রয়েছে, যাদের বাবার কোনো অভাব নেই, কিন্তু কে ভা খাবে তার কোনো লোক নেই। মানে, হাজার চেষ্টা সাধনা ও কামনা করেও তারা সন্তান লাভ করছে পারে নি। আবার কত অসংখ্য লোক এমন দেখা যায়, যারা কামনা না করেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক, কিন্তু তাদের কাছে খাবার কিছু নেই কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে নেই। তাই বলতে হয়, সন্তান হওয়া না হওয়া একমাত্র আল্লাহ্র তরফ থেকে এক বিশেষ পরীক্ষা, সন্দেহ নেই।

শুধু তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে মানুষের গোটা জীবনই একটা বিশেষ পরীক্ষার স্থল। আল্লাহ্র দেয়া মাল, সম্পদ, সম্পত্তি আর সন্তান - পরীক্ষার বিষয়সমূহের মধ্যে এ দুটো প্রধান। এ পরীক্ষায় তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে, যারা এক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকে সুষম ও সামঞ্জস্যসম্পন্ন নীতি গ্রহণ করতে পারে। সন্তানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির একটি দিক হচ্ছে এই যে, তার প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ও দরস মায়া আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য বোধকেও ছড়িয়ে যাবে এবং তারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে বাড়াবাড়ির অপর দিকটি হচ্ছে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, স্নেহ- বাৎসল্য প্রদর্শন ও তাদের হক আদায় করার পরিবর্তে তাদের প্রতি অমানুষিক জুলুম করা, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রত্যাহার বা প্রত্যাখ্যান করা। কুরআন মজীদে বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই মাল ও আওলাদকে ফেতনা বা পরীক্ষার বিষয় কিংবা দ্বীনী জিন্দেগী যাপনের পথে হুমকি স্বরূপ বলেই হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। জাহিলিয়াতের যুগে এ সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি অবলম্বিত হতো না। একদিকের বাড়াবাড়ি ছিল- সন্তান হত্যা করতেও সেকালের লোকেরা কুণ্ঠিত হতো না। আর অপরদিকের বাড়াবাড়ি এই ছিল যে, সন্তান সংখ্যার বিপুলতা নিয়ে তারা পারস্পরিক গৌরব ও জনশক্তির ফখর করত, শক্তির দাপট আর ধমক দেখাত, আভিজাত্যের অহংকারে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করত। আর এ কারণে তারা আল্লাহর কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠারও দাবি জানাত।

কুরআন মজীদ এ প্রেক্ষিতেই বলেছে ঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের ধনমাল ও সন্তান-সন্ততি ফেতনা বিশেষ; আর কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে বিরাট ফল।

বলা হয়েছে :

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

তোমাদের মাল এবং তোমাদের আওলাদ- কোনো কিছুই এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে, সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে। আমার নিকটবর্তী ও আমার নিকট মর্যাদাবান হবে তো কেবল তারা, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তাদের জন্যেই আমলের বিগুণ ফল রয়েছে এবং বেহেশতের সুসজ্জিত কোঠায় তারাই অবস্থান করবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা সহকারে।

আয়াতদ্বয় পূর্বাপর পটভূমিসহ প্রমাণ করছে যে, যেমন করে ধনমাল আল্লাহর দেয়া আমানত, সন্তান-সন্ততিও অনুরূপভাবে আল্লাহর দান। প্রথমটা যেমন একটা পরীক্ষার বিষয়, এ দ্বিতীয়টিও তেমনি একটি পরীক্ষার সামগ্রী। ধনসম্পদ অন্যায় পথে ব্যয় করলে কিংবা যথাযথভাবে ব্যয় না করলে যেমন আমানতে খিয়ানত হয়, সন্তান-সন্ততিকেও ভুল উদ্দেশ্যে ও অন্যায় কাজে নিয়োজিত করলে,

বাতিল সমাজ ব্যবস্থার যোগ্য খাদেম হিসেবে তৈরী করলেও তেমনি আল্লাহর আমানতে বিয়ানত হবে। আল্লামা আ-লুসী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

لانها سبب الوقوع فى الاثم والعقاب او محنة من الله عز و جل يختبر كم فلا يحملنكم حبها على الخيانة-

কেননা সন্তান গুনাহ এবং আধারে পড়বার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তা হচ্ছে আল্লাহ্র তরফ থেকে পরীক্ষার একটি সামগ্রী। অতএব, সন্তানের ভালোবাসা যেন তোমাদেরকে খেয়ানতে উদ্বুদ্ধ না করে।

সূরা আত-তাগাবুন-এ-ও মান ও আওলাদকে ফেতনা বলা হয়েছে এবং কোনো কোনো সন্তান পিতামাতার দুশমন' হতে পারে বলেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, এখানে বৈষয়িক বিষয়ের দুশমনীর কথা বলা হয়নি, আল্লাহর আনুগত্য ও দ্বীন ইসলাম মুতাবিক জীবন যাপনের পথে সন্তান-সন্ততির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোই হচ্ছে তাদের দুশমনী। বিশেষত তখন, যখন সন্তানের মায়া আল্লাহর ও রাসুলের প্রতি ভালোবাসা অপেক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে, তখন তাদের দুশমনী সত্যিই মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে। এ কারণেই বলা হয়েছে :

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তোমরা যদি তাদের মাফ করে দাও, তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করো, করো দয়া-দাক্ষিণ্য অনুগ্রহ, তাহলে তা ভালোই হবে। কেননা আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে মাফকারী ও দয়াবান।

বস্তুত সন্তানদের প্রতি সব সময় ক্ষিপ্ত হয়ে, খড়গহস্ত হয়ে থাকা আর প্রতি কথায় ও কাজে তাদের প্রতি রুঢ় ব্যবহার করা, গালাগাল করা মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। ইসলামে যেমন সন্তানের ওপর পিতামাতার হক ধার্য করা হয়েছে, তেমনি পিতামাতার ওপর সন্তানের হক নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

❐ সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য

সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পিতামাতার প্রতি তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কতক হক কার্যকর হতে শুরু করে এবং তখন থেকেই সে হক অনুযায়ী আমল করা পিতামাতার কর্তব্য হয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء: أن يحسن اسمه إذا ولد, ويعلمه الكتاب إذا عقل, ويزوجه إذا أدرك

পিতামাতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে প্রথমত তিনটি : জন্মের পরে পরেই তার জন্যে উত্তম একটি নাম রাখতে হবে, জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়লে তাকে কুরআন তথা ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে। আর সে যখন পূর্ণবয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

বস্তুত সন্তানের ভালো নাম না রাখা, কুরআন ও ইসলামের শিক্ষাদান না করা এবং পূর্ণ বয়সের কালে তার বিয়ের ব্যবস্থা না করা মাতাপিতার অপরাধের মধ্যে গণ্য। এসব কাজ না করলে পিতামাতার পারিবারিক দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। ভবিষ্যত সমাজও ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গড়ে উঠতে পারে না।

❖ ইসলামের পারিবারিক জীবন চারটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভিত্তি চারটি হচ্ছে ঃ-

(১) পারিবারিক জীবন মানবসমাজের লালনের ক্ষেত্রে দোলনাস্বরূপ। এটা সমাজের সব সদস্যের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক আবাসের ব্যবস্থা করে থাকে।

(২) পারিবারিক জীবন হলো নারী ও পুরুষের প্রকৃতিসম্মত যৌন আকাঙ্খা মিটাতে পারে।

(৩) পারিবারিক জীবন ভালোবাসা, দয়ামায়া. ক্ষমা ও করুনার মতো মানবিক গুণাবলির সৃজন ভূমি।

(৪) পারিবারিক জীবন মানুষের অন্তর্মূখী ও বহির্মূখী, দু'ধরনের দুঃখকষ্ট থেকে আশ্রয়ের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

এসব ভিত্তি কুরআনের বিধিবিধান এবং নবী করীম (সা) এর সুন্নার ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর এগুলো হস্তান্তরিত হয়ে আসছে প্রজন্ম তেকে প্রজন্মান্তরে। ইসলামি পারবারিক জীবনের সদা কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ বিষয় হলো, এই চারটি স্তম্ভের শক্তি গড়ে ওঠে সিস্টেমের দ্বারা। আর অবশ্যই এটা ভুলে গেলে চলবে না। পারিবারিক জীবনের সুফল শুধু রক্তসম্পর্ক পর্যন্তই বিস্তৃত নয়। এর আওতা মুসলমানের বিশ্বজনীন পরিবার তথা ইসলামি সৌভাতৃত্ব জুড়ে। "রাহেম" শব্দটির প্রকৃত অর্থ "দয়া করা"। আল্লাহত তায়ালার দু'টি নাম অঅর রহমান ও আর রাহীম। একই উৎস থেকে এসেছে। শব্দটি ভাবর্থগতভাবে আত্মীয়-পরিজন বোঝাতে ব্যবৃত হয়ে থাকে।

আল কুরতুবি বলেছেন, পারিবারিক যেসব বন্ধন অটুট রাখতে হবেই। সেগুলো একই সাথে সার্বজনীন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সার্বজনীন দিক হচ্ছে সম্পর্ক রাখার ইসলামি ধরন। যেমন, পারিবারিক বন্ধন সুষ্ঠভাবে বজায় রাখতে হবে বন্ধুত্ব, উপদেশ, ন্যায়ানুগতা, সুবিচারের সাথে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো আর্থিকভাবে সহায়তা, ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা প্রভৃতি।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে লোকেরা। তোমার প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি মাত্র শুক্রাণু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীকে বানিয়েছেন। আর ঐ দু'জন তেকে সৃচন করেছেন বহু নারী ও পুরুষ এবং ভয় কোর আল্লাহকে যাঁর নামে তোমরা একে অন্যকে ডেকে থাকো এবং (সর্তক থেকো) জরায়ুর ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর সর্বদা লক্ষ রাখছেন (আল কুরআন ৪.১)।

❐ ইসলামে পারিবারিক সম্পর্ক

মানব সমাজের সবচেয়ে অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। দুনিয়ার সর্বত্র পরিবার একটি মৌলিক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত। সমাজজীবনের প্রথম ভিত্তি ও বুনিয়াদ হলো পরিবার। তবে পরিবারের গঠন প্রকৃতি, কার্যাবলি ও দায়-দায়িত্ব নিয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কিছুটা ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক কাঠামো মূলত দুই ধরনের- যৌথ পরিবার এবং একক পরিবার। বাবা-মা, তাদের অবিবাহিত ছেলে, মেয়ে এবং এক বা ততোধিক বিবাহিত

সন্তান ও নাতি-নাতনিসহ যদি একই ছাদের নিচে বা ঘরে বাস করে, তাহলে সেটিকে যৌথ পরিবার বলে। অন্যদিকে পরিবারের কোনো সন্তান-সন্ততি বিবাহ করার পর তারা এবং তাদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে আলাদাভাবে বসবাস করলে তাকে একক পরিবার বলে। মানবজীবনের শুরু থেকেই পরিবার প্রথার সূচনা হয়েছে। আদ পিতা আদম (আ) এবং মা হাওয়া (আ)- এর মাধ্যম পারিবারিক জীবনের শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা বিকাশ লাভ করে।

অতএব দেখা যায়, পরিবারের প্রথম বিন্যাস হয়েছিলো স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে। তারপর ধীরে ধীরে তা বিস্তৃতি লাভ করে। এক আদম (আ) থেকে পরিবার অজস্র পরিবার হয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে দুনিয়ার সর্বত্র বিবাহ সংগঠনের মাধ্যমে পরিবারের ক্রমধারা অব্যাহত আছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একব্যাক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা কর এবং সতর্ক থাক জাতি বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন'।-সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১। আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন আরও বলেন, 'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তিামাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাত সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।'- সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৩

১.পরিবার: ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক সংগঠন। ইসলামী সমাজ কাঠামোতে মানুষ পরিবার, বিয়ে, তালাক ইত্যাদি বিষয়গুলোর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। মানুষ সৃষ্টির আদর্শ বিধি বা এর গোপন রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর প্রত্যেক বস্তু থেকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।'- সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৪৯। এই আয়াতের মর্ম থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে একেবারে মৌলিক বিষয়, যার মাধ্যমে অন্যান্য সম্পর্ক তৈরি হয় এবং বিশ্বের সকল সমাজে তা বিরাজমান আছে।

পুরুষের মধ্যে কতগুলো সহজাত ক্ষমতা ও দক্ষতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, যার কারণে তিনি পরিবারের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এককন পুরুষকে আল্লাহ সহজাতভাবে এমন নিয়ামাত দান করেছেন যাতে সে পরিবারকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং পরিবারের জন্য জীবিকা উপার্জন করার উদ্যোগ নিতে পারে এবং একজন নারীর চেয়ে এক্ষেত্রে পুরুষরা এগিয়ে আছে। তবে নারীদের ওপর পুরুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব কোনোভাবেই অসীম নয়। পুরুষের এই পদমর্যাদা কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমিত। আর তা হলো পরিবারের

প্রধানকর্তা ব্যক্তি হওয়ার কারণে যতটা প্রয়োজন সেখানে তার ক্ষমতার উচ্চতা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে সংসার পরিচালনা, সন্তান-সন্ততির যত্ন নেওয়া ইত্যাদি কাজে পুরুষের চেয়ে নারীরা এগিয়ে। একজন পুরুষের মূল দায়িত্ব হলো পরিবারের তথা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ এবং জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন নিশ্চিত করা। আর তার স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি তাকে মান্য করতে বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ না তিনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা)- এর অবাধ্য হওয়ার মতো কোনো আদেশ দেবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পূণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযতকারিণী ওই বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযত করেছেন।'- সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪

ইসলামে সামাজিক কাঠামো কুরআনের আলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণকামিতা এবং সমঝোতার মহিমায় ভাস্বর। এজন্য ইসলাম সামাজিক প্রয়োজণে কৌমার্যব্রতকে অস্বীকার করেছে এবং বিবাহকে ধর্মীয় ও নৈতিকভাবে বৈধ করেছে। একটি সুন্দর, মহিমান্বিত, সুখময় ও কল্যাণকর সমাজ বির্নিমাণের কন্য ইসলাম বিবাহকে একটি অত্যাবশকীয় বিধান হিসেবে ঘোষণা করেছে।

২. বিবাহ: মানবজীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মানুষের যৌনজীবনকে সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আবদ্ধ করা এবং বন্যপশুর বাদৃশ অবস্থা থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করা। এই কঠিন সমস্যার লাগাম টেনে এবং জটিল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ইসলাম স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করেছে এবং এটিকে একটি নিয়ম-পদ্ধতির আওতায় এনেছে। ইসলাম যৌনজীবনকে মেনে নিয়ে এর জন্য যুক্তিসঙ্গত যাবতীয় আইন ও পদ্ধতি তৈরি করেছে এবং বিয়ের মতো একটি কল্যাণকর ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য পরিবার গঠনের উদ্দেশে বিবাহবন্ধন হলো অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রথা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।'- সূরা আন- নূর, আয়াত: ৩২।

বিবাহ ব্যতিরেকে যৌন জীবনযাপনের কোনো সুযোগ নেই। বিবাহ হচ্ছে একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে একজন নারী ও পুরুষ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। বিবাহ অনেক লোকের উপস্থিতি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ভিত্তিক একটি উম্মুক্ত ঘোষণা যার মাধ্যমে নারী পুরুষ নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ও দায়িত্ব বরণ করে নেন। মানব সৃষ্টির শুরু থেকে ইলামের এই বিধান চালু ছিল এবং এখনও একই বিধান কার্যকর আছে।

লেখক: ড. মুহাম্মদ মোহন মিয়া, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক ও সাবেক ডিএমডি, ইসলামী ব্যাংক, বর্তমানে কো-অর্ডিনেটর, ইসলামী ব্যাংকিং কনভারশান প্রজেক্ট, স্ট্যান্ডর্ড ব্যাংক লিমিটেড।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পারিবারিক জীবন

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহীয়সী স্ত্রীগণের সাথে এমন মহৎ আখলাকের পরিচয় দিতেন, যা শুনে আজকের সভ্যতার দাবীদারগণ রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। তাদের এ অবাক হওয়াতে আমাদের কিছু যায় আসে না। বরং তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে আমাদের হাসি পায়। তাঁর বাস্তম জীবন ও ঘটনাবলীকে আমরা তাদের কোনরূপ খুঁত অন্বেষণের ভয়ে ভীত হয়ে গোপন রাখতে পরি না।

ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয়, যার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে গোপন রাখার কোন প্রয়োজন আছে। আমরা প্রকাশ্যে তা পেশ করে দিতে চাই। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তো আর বোকা নয়। আল্লাহ যাদেরকে সুস্থ জ্ঞান ও চিন্তা-শক্তি দান করেছেন, তারা অবশ্যই এর যথাযথ মূল্যায়ন করবে।

আপন স্ত্রীগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন আখলাক ছিলো যে, হযরত আয়েশা (রা) তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বাধিক কম বয়সী হওয়ার কারণে তিনি তাঁর বয়সের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য করে সর্বদা তাঁর মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকতেন।

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়োশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন অল্প বয়সী ও হালকা পাতলা গড়নের। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী ও ভারী দেহবিশিষ্ট। তাই এ দৌড় প্রতিযোগিতায় হযরত আয়েশা (রা) আগ্রগামী হয়ে গেলেন।

কিছুদিন পর পুনরায় তিনি হয়রত আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন। এবার তিনি আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অগ্রগামী হলেন। কেননা হযরত আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অগ্রগামী হলেন। কেননা হযলত আয়েশা (রা)-এর দেহ ইতিমধ্যে ভারী হয়ে গিয়েছিলো। মহিলাদের শরীর সাধারনত তাড়াতাড়ি ভারী হয়ে যায়। তাই তিনি এবার আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রগামী হয়ে গেলেন এবং বললেন, প্রথমবার তুমি অগ্রগামী হয়েছিলে , এবার অগ্রগামী হলাম।

সুবহানল্লাহ! কী মহৎ তাঁর চরিত্র! নবীকুল শিরোমণি হয়েও তিনি আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতার অংশ নিলেন। চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন যে, এটা কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন অর্থহীন কাজ ছিলো?

বস্তুত হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে তাঁর এ দৌড় প্রতিযোগিতার রহস্য হলো পরবর্তী উম্মতকে শিক্ষা দান করা। অধিক বয়সী পুরুষ অল্প বয়সী মেয়ে বিয়ে করলে তার বয়সের দাবী ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। নিজের বয়স অনুপাতে তাকেও ভাবগম্ভীর্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল বানানোর অপচেষ্টা করা নির্বুদ্ধিতা।

ছোট মেয়েদের মন খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ অধিক পছন্দ করে। তাই তাদেরকে এ সুযোগ দেয়া উচিত। স্বামীর আদম ও সম্মান রক্ষার্থে তারা খেলাধুলা ও আনন্দ -ফুর্তি করতে সংকোচ বোধ করলে তাদেরকে শুধু কথার মাধ্যমে নয় বরং আচরণের মাধ্যমে নিজের স্বতঃস্ফুর্ত সম্মতি জানিয়ে দেয়া উচিত। বস্তুত এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হযরত আয়েশা (রা.)- এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন।

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.) কে হাবশী ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা দেখার সুযোগ দিতেন। তারা মসজিদে নববীর সন্নিকটে তীর দ্বারা খেলতো। এমনকি তিনি তাঁকে পুতুল খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন। অনেক সময় এমন হতো যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গৃহে তাশরীফ আনতে দেখে মহল্লার মেয়েরা খেলা ছেড়ে দৌড়ে পালাতো। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে অভয় দিয়ে বলতেন, কোন ভয় নেই, তোমরা নিশ্চিন্তে খেলো।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবকারিক জীবনের উল্লিখিত ঘটনাবলীতে উম্মততের জন্য এ শিক্ষা রয়েছে যে, স্ত্রী স্বামীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী হলে তার বয়সের দাবী অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করবে। এটাই ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক শিষ্টাচার। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা ও কাজই উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর জীবনের এমন কোন কাজ নেই, যাতে উম্মতের জন্য শিক্ষা নেই।

গৃহে স্বামীর স্বভাব কেমন হওয়া উচিত

আমার জনৈক ধৈর্যশীল ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ মুতা'আল্লিক আছে। সে যেখানে বসবে বড়ই গাম্ভীর্যের সাথে বসবে। কারো সাথে হাসি-তামাসা ও আনন্দ-ফুর্তি করা তার ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যেতো না। একবার আমি ওয়াজের মধ্যে তার সম্পর্কে বললাম, এ ধরনের ভাবগাম্ভীর্য আমার কাছে মোটেও পছন্দনীয় নয়। প্রত্যেক্যের উচিত হাসি-খুশী ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে কথা-বার্তা বলা।এটা কেমন কথা যে, সর্বদা মুখ ফুলিয়ে রাখবে ? এ ধরনের ব্যক্তিকে

মানুষ পছন্দ করে না। তার সাথে কারো মহব্বত ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা গাম্ভীর্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অহংকার ছাড়া কিছুই নয়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক গাম্ভীর্যজূর্ণ কে আছে ? অথচ তিনি মানুষকে হাস্যোজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত চেহারায় সাক্ষাৎ দান করতেন। সাহাবায়ে কেরামের সাথে হাসি-খুশী অবস্থায় কথা বলতেন। সাধারণ মানুষ যে ভঙ্গিতে কথা-বার্তা বলতো, তিনিও অনুরূপ কথাবার্তা বলতেন। আমাদের ভাবগাম্ভীর্য কি তাঁর চেয়ে অধিক হয়ে গেলো ?

আমার তো অভ্যাস হলো, আমি মাদরাসায় বসে দোস্ত-আহ্বাবদের সামনে নিজের ঘরের অবস্থাও বলে ফেলি। এ ব্যাপারে আমার সেই মুতাআল্লিকের দ্বিমত ছিলো। সে বলতো, ঘরের কথা মজলিশে বর্ননা করে দেয়া ভাব-গাম্ভীর্যের পরিপন্থী। সে তো নিশ্চয় একথা আমার কল্যান কামী হয়েই বলতো। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটা তার ভুল ধারনা।

তাই আমি বললাম, মাওলানা! গাম্ভীর্য এটাকে বলে না। গাম্ভীর্য তো হলো, যা সুন্নাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রমানিত। আপনার এ বাহ্যতঃ গাম্ভীর্যের বদৌলতে আপনি কিছু সুন্নাতের আমল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। আচ্ছা সত্য করে বলুন তো দেখি, আপনি কি কখনও স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন? এটা তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। তিরি আয়েশা (রাঃ)- এর সাথে একাধিক বার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমার এ সৌভাগ্য হয়েছে। আমি এ সুন্নাতের উপরও আমল করেছি। আপনি আপনার সেই গাম্ভীর্যের মধ্যেই থাকবেন, বদৌলতে পারিবারিক জীবনের একিট সুন্নাতের আমল কখনও আপনার ভাগ্যে জুটবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা তো এই ছিলো যে, তিনি নিজ হাতে বকরীর দুধ দোহন করতেন। তরি-তররকারী কেটে দিতেন এবং ঘরের বিভিন্ন কাজে স্ত্রীগণকে সাহায্য করতেন। আলহামদুলিল্লাহ! এ সুন্নাতের উপরও আমরা আমল করার তওফীক হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এটাই যে, মুসলমান সহজ সরল জীবন যাপন করবে। আচার-আচরণ, চলাফেরা ও কথা-বার্তায় এমনভাবে থাকবে, যেন অপরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না পায়। মজলিসে বসরে এমনভাবে বসবে, যেন নিজেকে মজলিসের প্রধান মনে না হয়।

❐ দাম্পত্য সুখ লাভের উপায়

স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তাকে সুখে রাখার মাধ্যমে পার্থিব কল্যাণও সাধিত হয়। এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিময় হয়। সুখে-দুঃখে একজন অপরজনের অংশীদার হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মাধে যদি একতা, অকৃত্রিমতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে, তাহলে এর চেয়ে বড় সুখ পৃথিবীতে আর কি হতে পারে?

সুখ তো এরই মধ্যে যে, স্বামী গোটা দিন ক্লান্ত-পরিশান্ত হয়ে ঘরে এসে কথা-বার্তা ও আচরণ দ্বারা মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে। স্ত্রী তাকে মানসিক ও শারীরিক আরাম ও শান্তি দানে সচেষ্টা থাকবে।

দাম্পত্র জীবন যাদের সুখকর, তারা বস্তুত দুনিয়াতেই জান্নাত লাভ করে ফেললো। আল্লাহওয়ালাগণ স্ত্রীর সাথে হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্লচিত্ত থাকার রহস্য এখনেই যে, তাঁরা স্ত্রীকে সুখ-শান্তি দানে ও তার হক আদায়ে সদা যত্নবান থাকেন। ফলে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয় সুখ-আনন্দ ও সুশৃংখলার সাথে।

আর যে পরিবারে সর্বদা ঝগাড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ কলহ লেগে থাকে, সেখানে সুখের চিহ্নও থাকে না। এটা কেমন জীবন যে, সারাদিন খাটুন খেটে ক্লান্ত পরিশান্ত হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে একটু স্বস্তি লাভ করার পরিবর্তে তিক্ততা ও মনোমালিন্য সৃষ্টিকারী কথা-বার্তা চলবে? বর্তমানে মানুষের স্বভাব তবীয়ত বিগড়ে গেছে। অনুভূতিহীনততা মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলছে যে, মানুষ এ অবস্থায় থাকাকেই পছন্দ করে। তবে আল্লাহ যাদেরকে সামান্যতম অনুভূতি দান করেছেন। তারা অবশ্য এটাকে দুনিয়ার জাহান্নাম মনে করে।

এমন দাম্পত্য জীবনের কি মূল্য আছে যে, দু'চার দিন হাসি-খুশীতে থাকবে এবং দশদিন ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-কলহ চলতে থাকবে? দাম্পত্য জীবনেরর যথার্থ স্বাদ তো তখনি আস্বাদন করা যাবে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একজন অপরজনের অধিকারের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্যে রাখে।

স্ত্রীকে আরামে ও শান্তিনে রাখার মধ্যে কল্যাণ নিজেরই। এখানে কিছু মহিলা এমন আছে, দাম্পত্য জীবনে যারা অত্যন্ত সুখী। যাদের বয়স অন্তন চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের কম নয়। অথচ তাদেরকে কেউ পঁচিশ বছরের অধিক বয়সী বলবে না।

অতএব, স্ত্রীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তির সাথে রাখার মধ্যে একটি বড় ফায়দা এটাও যে, স্ত্রী সুস্থ-সবল থাকবে। দুর্বলতা ও রোগব্যধি তাকে দ্রুত আক্রমণ করবে না। ফলে তার দ্বারা দীর্ঘকাল ও রোগব্যধি তাকে দ্রুত আক্রমণ করবে না। ফলে তার দ্বারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বামী উপকার লাভ করতে পারবে। কিন্তু আফসোস! মানুষ নিজের শান্ত ও কল্যাণের কথা চিন্তা করেও স্ত্রীর প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখে না।

ইসলামে পারিবারিক বিকাশ

মানবজাতির প্রাথমিক ভিত্তি হলো তার পরিবার। পরিবার থেকেই পর্যায়ক্রমে মানুষ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সমাজ, অতঃপর অর্থনৈতিক লেনদেন, সেখান থেকে রাজনৈতিক কর্মকারে সূত্রপাত। এভাবে মানবজাতির বিকাশ, সমাজ সভ্যতার সৃষ্টি, সংস্কৃতিবোধের উন্মেষ্ যে জাতির পারিবারিক বন্ধন যত দৃঢ় সে সমাজ ততই উন্নত ও শক্তিশালী। পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন মুসলিম সমাজে তার সব কিছুই বিদ্যমান রয়েছে।

পরিবার বিকাশ লাভ করে, সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়, পারস্পরিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। সুখে-দুঃখে মানুষ একে অপরকে সহযোগিতা করে, সহমর্মিতা দেখায়। আমাদের পরিবার প্রথার অন্যতম আকর্ষণীয় দিক ছিল পরিবারে দাদা-দাদি আর নানা-নানি এবং ছোটচ নাতি-পুতি নিয়ে এক প্রকার আনন্দময় সংসার। যৌথ পরিবারে কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হলেও সুবিধাই ছিল বেশি। যৌথ পরিবারে ছেলেমেয়েদের লালানপালনে দাদা-দাদিরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিশুরা তদিের কাছ থেকে গল্পের ছলে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। অথচ আজকের একক পরিবারে একটি সন্তান পালন করাও কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

পরিবার গঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য প্রবৃত্তির চাহিদা নিবারণ হলেও এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বংশধারা সংরক্ষণ, স্হিতিশীল সমাজ গঠন, মানবজাতির বিকাশ এবং পূর্ণ শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা। অন্যায়-অশ্লীলতা পরিহার করা। ইসলামী সমাজ রক্ষায় আমাদের পারিবারিক বিকাশকে সঠিক আদর্শের ওপর গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

ইসলামী সমাজে পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দর্য়িত্ব, তাদের পারস্পরিক আচার-আচরণ, সন্তানের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। কারো দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ইসলামে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশু জন্ম হলে তার প্রতি পিতা-মাতার করণীয় সব বিছু নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সন্তান লালনপালনে কষ্টের কারণে ইসমামে তাদের মর্যদা এত বেশি দেয়া হয়েছে, ইসলামে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের পরে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনকে আবশ্যক করে দিয়েছে। মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসুল (সা.) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতার যেকোনো একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, অথচ সে জান্নাত লাভ করতে পারল না তাদের নাক ধুলিময় হোক।' সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক সম্পর্কে রাসুল (সা.)-যে আদর্শ শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন তার কোনো তুলনা হয় না।

তথ্যসূত্র: আবু শরীফ মাহমুদ খান ১৩ই মে ২০১১ দুপুর ১.১১

পরিবার ও সমাজ গঠনে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকাঃ

এ জন্যই পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের ভূমিকার মধ্যে কোনো ধরনের বৈপরীত্য, নিজের প্রাধান্য সৃষ্টি করার কোনোও অবকাশ নেই, প্রত্যেকের একটি সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা রয়েছে এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে গণ্য। তাই পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে একজন নারীর প্রথম দায়িত্ব ও ভূমিকা মা ও মাতৃত্বের ভূমিকা পালন, যা পরিবার ও সমাজের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ একজন নারী মা হিসেবেই তার সন্তান সন্ততিকে হাজার কষ্টের পরও সারা রাতের আরামের ঘুম হারাম করে সর্বাধিক আদর সোহাগ আর স্নেহ মমতার ভিতর দিয়ে লালন পালন করেন, যা একজন পুরুষ কখনও করতে পারে না। এটিই হচ্ছে একজন নারী ও পরিবারের কাছ থেকে সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী শরী'আত সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। সুতরাং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের বিরোধিতা সমাজের যে কেউ করুক না কেন সে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঠিক ফিতরাত/স্বভাব থেকে দূরে সরে যাবে এবং ইসলামী শরী'আতের বিরোধিতা করবে। এটা সে পাশ্চাত্য প্ররোচনায় করুক আর ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অন্ধ অনুকরণেই করুক, সমান কথা। যে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের প্ররোচনায় আজ নারী সমাজকে দেহ-ব্যবসা আর যৌনাচারে লিপ্ত করে তাদের ভোগের পাত্র আর খেলনার উপকরণে পরিণত করেছে। তেমনিভাবে কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের অন্ধ অনুকরণ আর অন্ধ বিশ্বাসের কারণে নারীদেরকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা, যথাযথভাবে সন্তান লালন-পালন, স্বামীর সেবা ও তাকে সহযোগিতা করা। জাতি ও সমাজের সেবামূলক শিক্ষাদীক্ষা ও চিন্তা-চেতনা থেকে বঞ্চিত করে অজ্ঞতা,মূর্খতা, সংকীর্ণতা বন্দিশালায় আবদ্ধ করে রেখেছে। অথচ আধুনিক বিশ্বে দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় এবং নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য, প্রযুক্তিগত উপকরণ তৈরী করা হয়েছে। যাতে সে নিজেকে পরবিার, সন্তান-সন্ততি ও সমাজ সেবার জন্য প্রস্তুত করে নিতে পারে।

❐ মুসলিম সমাজে একজন নারীর প্রধান দায়িত্বঃ

এ জন্য ইসলামী শরী'আত ও মুসলিম সমাজে নারী এবং পুরুষের ভূমিকা নিয়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবী গবেষক ও চিন্তাবিদগণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে উত্তম পন্থায় নারী ও পুরুষের শক্তি ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে ইসলামী শরী'আতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যায় এবং সুশৃঙ্খলভাবে মুসলিম উম্মাহ ও সমাজের খেদমত করা যায়।

এই সকল প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে একটাই। তা হচ্ছে পারিবারিক ভূমিকাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। পারিবারিক ভূমিকার মাধ্যমে সঠিকভাবে শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে হবে। তাহলে এক পর্যায়ে জাতি এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যস্থলে পৌছাতে পারবে।

এর কারণেই মা ও মাতৃত্ব এবং পরিবারকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং দিতে হবে। তাদেরকে সকল বিচ্ছেদ, ভাঙ্গন এবং বিভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। পশ্চিমা চিন্তা- চেতনা ও প্রভাবমুক্ত করে সামাজিক উন্নয়নের জন্য মা ও পরিবারকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ইসলামী চিন্তা- চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে আলাদা ও ভিন্ন।

এ জন্যই আমাদের উচিৎ এবং কর্তব্য হচ্ছে নারী এবং পুরুষ উভয়ই সমাজের অংশীদার হিসেবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্মসংস্থান ও উপার্জনের যথাযথ ব্যবস্থা করা। যাতে সঠিকভাবে আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা যায়।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী নারী পুরুষ এবং সমাজের সকল সদস্যের জন্য সহজ এবং সুশৃঙ্খলভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

❐ আদর্শ জাতি গঠনে পরিবারের ভূমিকাঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, স্থপতি, সংস্কারকগণ শিশুর লালন-পালন, পরিচর্যা, শিশু বিষয়ক তা'লীম-তরবিয়ত, ও তার কারিকুলাম উন্নয়ন এবং শিশু বিষয়ক সংস্কৃতির সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেন নি, বরং তারা গুরুত্ব দিয়েছে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে, যার ফলে জাতির নতুন প্রজন্ম থেকে আমাদের আলো নির্বাপিত হয়ে গেছে, স্থবির হয়ে গেছে আশা আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনা। জাতি পরিণত হয়েছে একটি প্রাণহীন দেহতে। অথচ উচিৎ ছিল বাল্য বয়সেই একটি শিশুর ভিতরে সে সকল মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠিত করা।

সুতরাং এ নিস্প্রাণ জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে হলে এবং সমস্যার সমাধান করতে হলে, শিশু বিষয়ক তা'লীম-তরবিয়ত-পরিচর্যা এবং নারী ও পরিবার সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে গুরুত্ব দিতে হবে।

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যে জাতি আজ সর্বস্তরে পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ এবং উপনিবেশ ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের শিকার, তেমনিভাবে ধাঁধা লাগানো অত্যাধুনিক নানা আবিষ্কারে আর বিজ্ঞাপনে দিশেহারা, সে জাতি কীভাবে তাদের শিশুর সেই হারানো অদৃশ্য শক্তিকে ফিরে পাবে এবং নতুন প্রজন্ম থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারবে। এবং তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে পারবে?

ইসলামে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার তাগিদ

ধর্ম ডেস্কঃ মানুষ বেড়ে ওঠে পরিবারে। পৃথিবীতে চোখ খুলেই একটি শিশু দেখতে পায় তার পারিবারিক পরি মন্ডল। মানুষের জীরনের প্রতিটি ধাপই পারিবারিক পরিমন্ডেল কাটে। পারিবারিক সংযোগ ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন। পৃথিবীতে যত প্রেম-ভালবাসা, দয়া-অনুগ্রহ সবই আবর্তিত হয় পরিবার থেকে। মানুষের জীবনের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুর ভিত গড়ে ওঠে পরিবারে। এ জন্য জীবনের সাফল্যের পেছনে পরিবারের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। আর ইসলামও পরিবার প্রথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামের পারিবারিক ঐতিহ্য আজো মুসলিম সমাজে নৈতিক ভিত্তিটাকে নড়বড়ে হতে দেয়নি। আরবি 'রাহেম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ জরায়ু এর উৎপত্তি (রাহিম) থেকে, যার অর্থ 'দয়া করা'। আল্লাহ তায়ালার দুটি নাম রাহমান ও রাহিম একই উৎস থেকে এসেছে। শব্দটি ভাবার্থগতভাবে আত্মীয়-পরিজন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেছেন, 'হে লোকেরা, তোমার প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদের একটি মাত্র শুক্রাণু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীকে বানিয়েছেন। আর ওই দু'জন থেকে সৃজন করেছেন বহু নারী ও পুরুষ এবং ভয় কর আল্লাহকে, যার নামে তোমরা একে অন্যকে ডেকে থাকো এবং (সতর্ক থাকো)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর সর্বদা লক্ষ্য রাখছেন।' ইসলাম পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার তাগিদ দিয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের ব্যাপারে রাসুল (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। মানুষের খরচের সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে পরিবার কে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামি বিধি মোতাবেক মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু এমনকি মৃত্যুর পরেও পরিবারের থাকলে তার বিচ্যুতির আশঙ্কা কম থাকে। পারিবারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা পেলে কেউ হতাশ হয় না। বিপদ-আপদে সবচেয়ে আগে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় পরিবারের সদস্যরা। মানুষ যখন পরিবার থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে, তখনই হতাশা তাকে গ্রাস করে নেয়। তখন সে নানা অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক বন্ধন ততটা সুদৃঢ় নয়। এ জন্য সেখানকার মানুষ হতাশাগ্রস্ত। আমাদের দেশের পারিবারিক একটি ঐতিহ্য আছে। সুস্থ ও শালীন সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থেই পারিবারিক এই ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা দরকার। পরিবার প্রথায় চির ধরলে আমাদের সমাজের অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে ইসলামের নিদের্শনা

পারিবারিক বন্ধন মহান স্রষ্টার অপার ও নিপুন এক উপহার। সামাজিক বন্ধন শুধু মানবের জন্য হলেও পরিবারিক বন্ধন রয়েছে সৃষ্টি জগতের প্রায় সব প্রাণীর মাঝে। দিনের শেষে সন্ধ্যা এলে আমরা ফিরে আসি বাসস্থানে, পরিবারের আত্মিক বন্ধনে। আবার রাত শেষে প্রভাত এলে ছুটে চলি নিজ কর্মস্থলে। তবে দেহ অমাদের সঙ্গে চললেও মন থেকে যায় পরিবারে। আর এ মনের টানের বড় কারণ, মহান প্রভু সৃষ্টিগতভাবেই পারিবারিক বন্ধনের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন।

কিন্তু বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। যতদিন যাচ্ছে আমাদের পারিবারিক বন্ধন ততই শিথিল হচ্ছে। কেননা চারপাশের পরিবেশ ক্রমেই আমাদের যান্ত্রিক ও পোশাকী করে তুলছে। এক পরিবারের সদস্য হয়েও প্রত্যকে যেন আলাদা গ্রহের বাসিন্দা। আর এ চিন্তাচেতনা আমাদের ঠেলে দিচ্ছে বিপদের দিকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে দিন দিন বাড়ছে হার্টের রোগী। **ক্রমেই মানুষ এ প্রাণঘাতী অসুখে আক্রান্ত হচ্ছেন। হার্টের এ রোগ থেকে কিছুটা উপশমের জন্য ডাক্তারগণ বলে থাকেন সকালের মুক্ত বায়ু সেবন করতে। সেবণ করা হচ্ছে মুক্ত বায়ু, আবিষ্কার হচ্ছে উন্নত থেকে অতি উন্নত মেডিসিন। কিন্তু শেষ রক্ষা কি** হার্টের রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে অবশেষে বেড়িয়ে এসেছে মূল রহস্য। পারিবারিক বন্ধনের দীপগুলো আলো হারানোর কারণে শক্তি হারাচ্ছে মানুষের হার্ট। মানবতার নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে এমন বিপদসঙ্কুল অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারিবারিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির তিকেই ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে [সহিহ বুখারিঃ ৫৯৮৬]

বাড়ছে সামাজিক বিশৃঙ্খল, অনাচার, অনিয়ম। আর এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে এককভাবে না হলেও সমাজে ও রাষ্ট্রে পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব উপলব্ধি হচ্ছে। দেরিতে হলেও আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছি পারিবারিক সম্প্রীতির উপকারিতা। কিন্তু আমরা যদি মানবতার নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে নিজেকে সাজাতে পারতাম, তাহলে পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা আমরা এতো পরে এসে বুঝতাম না। কেননা আমাদের মাঝখান থেকে পারিবারিক ও আত্মীয়তার বন্ধন হারাতই না।

প্রিয় নাবীজি এ বন্ধনের প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য সেই দেড় হাজার বছর আগে সতর্ক করেছেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি মহান আল্লাহ বলেছেন- আমি রহমান। আত্মীয়তার বন্ধন হচ্ছে রহিম। যা আমি আমার নাম থেকে নির্গত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়দেরকে সংযুক্ত রখিে আমিও তাকে সংযুক্ত রাখব এবং যে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। আমিও তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করব। [সুনানে আবু দাউদ: ১৬৯৪]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে বলেন- আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মতো মারাত্মক আর কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তায়ালা যার সাজা পৃথিবীতেও প্রদান করেন এবং পরকালের জন্যও অবশিষ্ট রাখেন। [জামেউত তিরমিজি: ২৫১১ সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২১১]

তিনি আরো বলেন-

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে। সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম সূত্রে রিয়াযুস সলেহিন: ৩১৯]

মহান বন্ধনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে মানবতার নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেন- তোমরা যদি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ তাহলে নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [রিয়াযুস সলেহিন: ৮৪৩]

পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে ইসলামের পাঁচটি নির্দেশনা

আওয়ার ইসলাম ডেস্ক: একটি পারিবারিক ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে পৃথিবীতে মানবজাতির যাত্রা শুরু হয়। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে প্রথম মানব আদম (আ) ও প্রথম মানবী হাওয়া (আ) কে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করে প্রেরণ করেন এবং পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটে ইসলাম মানবজাতিকে পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশনা দিয়েছে।

পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার কিছু নির্দেশনা:

১. পরিবার মানুষের আশ্রয় : পরিবার-পরিজন মানুষের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয় । পরিবার মানুষের বৈষয়িক ও মানসিক আশ্রয় । পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তাতে বহুনির্দেশনা আছে।" (সূরা রোম আয়াতে ২১)

২. **পারিবারিক সম্পর্কে বিপর্যয় থেকে রক্ষা:** পারিবারিক সম্পর্ক অটুট থাকলে মানুষ বহু বিপদ থেকে রক্ষা পায় সমস্যা ও বিপদ থেকে রক্ষা পায়। কেননা তারা পরস্পরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে মহান আল্লাহ বলেন, 'আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্মুখ অবহিত' (সূরা আনফাল আয়াত ৭৫)

৩. **পারিবারিক বন্ধন রক্ষায় বৈষয়িক লাভ:** বর্তমান সময়ে বহু মানুষ পার্থিব লাভ ক্ষতির বিবেচনা করে পারিবারিক পরিবার পরিজনকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্ক রক্ষাকারীর জন্য পার্থিব কল্যাণের সুসংবাদ দান করেছেন। তিনি বলেন,' যে ব্যক্তি চায় তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। (সহীহ বুখারি হাদিস ৫৯৮৬)

৪. **ধর্মের নামেও বিচ্ছিন্নতা নয়ঃ** ইসলাম পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন অনুমোদন করেন না। এমন কি আল্লাহর অধিক ইবাদতের জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অনুমতি নেই। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। বিয়ে পরিহারের কারণে মানুষ বহু কল্যাণ ও মর্যাদা থেকে বদনীত হয়।' (ফিকহুস সুন্নাহ ৩/৩৬)

৫. **কষ্ট হলে পরিবার থেকে দূরত্ব নয়ঃ** পারিবারিক জীবনে নানা ধরনের সংকট তৈরি হয়। ভুল বোঝাবুঝি মত ভিন্নতা দেখা দেয়। ইসলাম এমন সমস্যা গুলো উপেক্ষা করে পারিবারিক জীবন যাপনের নির্দেশ দেয়। ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন যাপন করবে, তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে অপছন্দ করছ।' (সূরা নিসা আয়াত ১৯)

আল্লাহ আমাদের পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা রক্ষা করুন আমীন।

পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা রোধে ইসলামের নির্দেশনাঃ

পরিবার মানব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি পারিবারিক ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে পৃথিবীতে মানবজাতির যাত্রা শুরু হয়। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে প্রথম মানব আদম (আ.) ও প্রথম মানবী হাওয়া (আ.)-কে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করে প্রেরণ করেন এবং পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটে। ইসলাম মানবজাতিকে পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে।

পারিবারিক বন্ধন আল্লাহর অনুগ্রহ : পরিবার ও পারিবারিক বন্ধন আল্লাহর অনুগ্রহ। সুতরাং তা অটুট রাখা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। ইরশাদ হয়েছে, 'এবং আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। ' (সুরা নাহল, আয়াত : ৭২)

পরিবার মানুষের আশ্রয় : পরিবার-পরিজন মানুষের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয়। পরিবার মানুষের বৈষয়িক ও মানসিক আশ্রয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তাতে বহু নিদর্শন আছে। ' (সুরা রোম, আয়াত : ২১)

পারিবারিক সম্পর্ক বিপর্যয় থেকে রক্ষা: পারিবারিক সম্পর্ক অটুট থাকলে মানুষ বহু ব্যাক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। কেননা তারা পরস্পরকে সাহায্য দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানের একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।' (সূরা আনফাল, আয়াত:৭৫)

পারিবারিক বন্ধন রক্ষায় বৈষয়িক লাভ : বর্তমান সময়ে বহু মানুষ পার্থিব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা করে পরিবার-পরিজনকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) সম্পর্ক রক্ষাকারীর জন্য পার্থিব কল্যাণের সুসংবাদ দান করেছেন। তিনি বলেন, ব্যক্তি চায় তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। ' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৮৬)

ধর্মের নামেও বিচ্ছিন্নতা নয় : ইসলাম পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন অনুমোদন করে না। এমনকি আল্লাহর অধিক ইবাদতের জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অনুমতি নেই। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। বিয়ে পরিহারের কারণে মানুষ বহু কল্যাণ ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। ' (ফিকহুস সুন্নাহ : ৩/৩৬)

কষ্ট হলেও পরিবার থেকে দূরত্ব নয় : পারিবারিক জীবনে নানা ধরনের সংকট তৈরি হয়। ভুল বোঝাবুঝি ও মতভিন্নতা দেখা দেয়। ইসলাম এমন সমস্যাগুলো উপেক্ষা করে পারিবারিক জীবনযাপনের নির্দেশ দেয়। ইরশাদ হয়েছে, "তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করবে, তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ। (সুরা নিসা, আয়াত : ১৯)

পারিবারিক সংকট দূরের উদ্যোগ : পারিবারিক জীবনে কোনো সংকট দেখা দিলে তা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার পরিবার থেকে একজন ও তার পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ের নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত। ' (সুরা নিসা, আয়াত : ৩৫)

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, শুধু স্বামী- স্ত্রী নয়; বরং পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে মনমালিন্য তৈরি হলে পরিবারের অভিভাবকরা দ্রুততম সময়ে তা সমাধানের উদ্যোগ নেবেন।

আত্মীয়তার ব্যাপারে উদাসীনতা নয় : আত্মীয়-স্বজন পারিবারিক সম্পর্কের ব্যাপারে উদাসীনতা কাম্য নয়। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহকে ভয় কোরো, যার নামে তোমরা পরস্পরের কাছে যাঞ্চা কোরো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন। (সুরা নিসা, আয়াত : ১)

সুসম্পর্ক ঈমানের নিদর্শন : আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক মুমিনের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। মুমিন কখনো তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬১৩৮)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ : সাধারণত মানুষ তাদের সঙ্গেই সম্পর্ক রক্ষা করে, যে তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি হলো প্রতিদান দানকারী। বিচ্ছিন্নতার পর যে সম্পর্ক রাখে সেই প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। ইরশাদ হয়েছে, 'প্রতিদানকারী আত্মীয় হক সংরক্ষণকারী নয়; বরং আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী সে ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও তা বজায় রাখে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৯১)

দায় নয়, দায়িত্ব : পারিবারিক ব্যয় নির্বাহকে অনেকে সামাজিক দায় মনে করেন। কিন্তু ইসলাম একে দায়িত্ব আখ্যা দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে। বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা কোরো না কেন আল্লাহ তো সে সম্পর্কে অবহিত।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৫)

পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার প্রতি হুঁশিয়ারি : আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারীদের প্রতি পবিত্র কোরআনে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, 'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ তাদেরই অভিশাপ করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।' (সুরা মুহাম্মদ, আয়াত : ২২-২৩)

সম্পর্কচ্ছেদের ভয়াবহ পরিণতি : আত্মীয়তা ও পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণতি ভয়াবহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৫৬)

আল্লাহ আমাদের পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা রক্ষা করুন। আমিন।

আদর্শ মুসলিম পরিবারের ১০ বৈশিষ্ট্যঃ

পরিবার মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পরিবার থেকেই মানুষের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘর ও পরিবারকে তাঁর অন্যতম দান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের ঘরকে করেছেন তোমাদের আবাসস্থল। (সুরা : নাহল, আয়াত : ৪০)

ঘর ও পরিবারকে মানুষের প্রকৃত আবাস ও আশ্রয় হিসেবে গড়ে তুলতে ইসলাম বহুমুখী নির্দেশনা দিয়েছে। যার মাধ্যমে একটি আদর্শ পরিবার গঠন করা সম্ভব। কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত আদর্শ মুসলিম পরিবারের ১০টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

১. আদর্শ স্ত্রী নির্বাচন

আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের প্রথম শর্ত আদর্শ স্ত্রী নির্বাচন করা।

স্ত্রী নির্বাচনে কোরআনের নির্দেশনা হলো- 'তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম' (স্বামীহীন নারী) তাদের বিয়ে করো এবং তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৩২)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা চার গুণ দেখে মেয়েদের বিয়ে করো : তার সম্পদের জন্য, তার বংশ পরিচয়ের জন্য, তার সৌন্দর্য্যের জন্য ও তার ধার্মিকতার জন্য।

অতঃপর তুমি ধার্মিকতাকে অগ্রাধিকার দাও। নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০৯০)

২. দ্বিনের চর্চা থাকা

আদর্শ মুসলিম পরিবারে দ্বিনের চর্চা থাকবে। সেখানে ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুশাসন, আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতিপালন, কোরআন তিলাওয়াত ও জিকির এবং

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের চর্চা থাকবে। তাদের জীবনযাপনে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত হবে।

আল্লাহ বলেন, "আমি মুসা ও তার ভাইয়ের প্রতি প্রত্যাদেশ দিলাম-মিসরে তোমার সম্প্রদায়ের জন্য ঘর নির্মাণ করো। তোমাদের ঘরগুলোকে

'ইবাদতখানা' করো, তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও।' (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ৮৭)

পরিবারে দ্বিনচর্চা উৎসাহিত করতে পারবারপ্রধান ও অভিভাবকরা নিজের দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করবে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন ঘরে ফিরতেন তাঁর হাতে মিসওয়াক থাকত।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৩)

৩. ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা

আদর্শ মুসলিম পরিবার তাদের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা প্রদান করবে। কোনো কারণে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো সম্ভব না হলে, অন্তত দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় (ফরজ) ধর্মীয় জ্ঞান যেন শিশুরা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা মুসলমানের জন্য ফরজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, '(ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২৪) ইসলামী পঠনসামগ্রী থাকা আদর্শ ইসলামী পরিবার প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষার ওপর নির্ভর করবে না; বরং পরিবারে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করবে। যাতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের পাশাপাশি কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ইসলামী সাহিত্য ও ইতিহাস- ঐতিহ্যবিষয়ক বই থাকবে। শিশুদের ইসলামী সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত করে তুলবে। বর্ণিত আছে, 'জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ। যখন সে তা পায় সংরক্ষণ করে এবং অপর হারানো বস্তুর অনুসন্ধান করে।' (শায়খ আলবানি এই বর্ণনার সনদকে সহিহ বলেছেন। বিস্তারিত : https://bit.ly/2H4HT8h)

সুতরাং পরিবারে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার একটি আবহ সৃষ্টিকরতে হবে।

৪. পারস্পরিক জবাবদিহি

কোনো পরিবারকে আদর্শ পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাতে অবশ্যই 'ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধে'র চর্চা থাকতে হবে। এই ক্ষেত্রে ছোটরা বড়দের কাছে জবাবদিহি করবে আর বড়রা ছোটদের সামনে নিজেদের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবে। তাদের সামনে অপরাধ করতে লজ্জাবোধ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।' (সুরা : আশ- শুয়ারা, আয়াত : ২১৪)

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর পরিবারের ৩০ জন সদস্যকে একত্র করে সতর্ক করে বলেন, 'তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।' (তাফসিরে ইবনে কাসির)। সুতরাং মুসলিম পরিবার পারস্পরিক পরামর্শ, সহযোগিতা; জবাবদিহি ও সতর্কীকরণের মাধ্যমে নিজেদের সুপথে নিয়ন্ত্রিত করবে।

৫. পরস্পরকে সহযোগিতা

সাংসারিক কাজে পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। কারো ওপর নির্ভর করে থাকবে না। শিশুদেরও ছোট থেকে স্বনির্ভর হতে শেখাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) পারিবারিক কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন। পারিবারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা আল্লাহ ভালোবাসেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ যখন কোনো পরিবারের কল্যাণ চান, তখন তাতে মমতা ও ভালোবাসা দান করেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৫৯৩)

৬. পর্দা ও শালীনতা

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শালীনভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছে। তবে নারীর প্রতি যেহেতু পুরুষের আকর্ষণ অনেক বেশি প্রবল তাই নারীকে নারীসুলভ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার নির্দেশ দিয়েছে। অশ্লীল পোশাক ও চালচলন পরিহার করতে বলেছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা ঘরে অবস্থান করো এবং জাহেলি (বর্বর) যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করো না।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৩৩)

শুধু বাইরে নয়; বরং ঘরেও নারী-পুরুষ উভয়কে শালীনভাবে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা সুরা নুরের ৩১ ও ৫৮-৫৯ নম্বর আয়াতে বুঝমান শিশুর সামনে শালীন পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছে। শালীনতা নষ্ট হয় এমন সময় (ফজরের আগে, দুপুরে বিশ্রামের সময় ও এশার পর) ঘরে প্রবেশের আগে তাদের অনুমতি নিতে বলা হয়েছে।

৭. পাপ ও পাপ উপকরণমুক্ত হওয়া

পাপ ও পাপের উপকরণ থেকে মুক্ত থাকবে আদর্শ মুসলিম পরিবার। কেননা পাপের উপকরণ পাপ কাজে উৎসাহিত করে। আর পাপ পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শান্তি নষ্ট করে। এমনকি কোনো ভালো উপকরণের মন্দ ব্যবহার বেশি হলেও তা পরিবার থেকে দূরে রাখবে। আর যে উপকরণের মন্দ ব্যবহারই বেশি তা অবশ্যই পরিহার করবে। ভালো ও মন্দ জিনিসের ব্যবহার বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদিস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যেতে পারে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত আতর বিক্রেতা ও কামারের হাপরের মতো। আতর বিক্রেতার কাছ থেকে হয়তো তুমি আতর কিনবে বা তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কামারের হাপর তোমার শরীর বা কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস ; ২১০১)। আবদুর রহমান হাসান জানকা বলেন, ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে বিচ্ছেদ ও দ্রোহের আগুন নেভাতে শিকড় থেকে চরিত্র সংশোধন করতে হবে। কেননা পাপে মত্ত ব্যক্তিরাই পরিবার ও আপনজন থেকে দূরে সরে যেতে চায়। পাপ তার ভেতর অস্থিরতা দূর করে।' (আল আখলাকুল ইসলামিয়া ও আসাসুহা : ১/৩৮)

৮. সময়ের শৃঙ্খলা

সময়ের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা আদর্শ পরিবারের জন্য অপরিহার্য। বিশেষত পরিবারের নামাজ, ইবাদত ও দ্বিনি জ্ঞানচর্চায় সময়ের শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাজের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীত হয়ে দাঁড়াও।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৩৮)

এ ছাড়া শিশুদের পড়ালেখা, খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা ও ঘুম ইত্যাদি যেন সময়মতো হয় তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন কোনো বান্দা সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে

জিজ্ঞেস করা হবে, সে জীবন (সময়) কোথায় ব্যয় করেছে, জ্ঞান কী কাজে লাগিয়েছে, সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে এবং শরীর কোথায় উন্মুক্ত করেছে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৭)

৯. গোপনীয়তা রক্ষা

পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা আদর্শ মুসলিম পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটা শুধু দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা নয়; বরং অন্যান্য বিষয়েও গোপনীয়তা রক্ষা করা আবশ্যক। পারিবারিক কলহ- বিবাদ মীমাংসার পদ্ধতি তুলে ধরে পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা করলে তোমরা তার (স্বামী) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রী) পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৩৫)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, পারিবারিক জীবনে কোনো সংকট দেখা দিলে তা নিজেদের মধ্যে গোপন রাখবে এবং নিজেরাই তার সমাধান করবে। আর দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'অবস্থানের দিক থেকে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট মানুষ হলো যে স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যায় এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর কাছে যায়, অতঃপর সেই গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৪৩৭)

১০.পরস্পরকে সহযোগিতা

সংসারিক কাজে পরিবারের সদস্যসরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। কারো ওপর নির্ভর করে থাকবে না। শিশুদের ছোট থেকে স্বনির্ভর হতে শেখাবে। রাসুলুল্লাহ (সা:) পারিবারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা আল্লাহ ভালোবাসেন। রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন, আল্লাহ যখন কোন পরিবারের কল্যাণ চান, তখন তাতে মমতা ও ভালোবাসা দান করেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস:১৫৯৩)

উপসংহার

মাতৃগর্ভে জন্ম নিলেই একটি শিশু মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠে না। মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তাকে মূল প্রশিক্ষণ দেয় পরিবার। কাজেই একটি সভ্যতা নির্মানের জন্যে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পাশ্চাত্যে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন এ প্রতিষ্ঠানটি আজ বিপর্যয়ের মুখে। পরিবারই যে মানজাতির শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, সে কথাটি যেন পাশ্চাত্যের সরকার ও নীতিনির্ধারকরা ভুলতেই বসেছেন। পরিবার যে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, সে কথাটি যেন পাশ্চাত্যের সরকার ও নীতিনিধারকরা ভুলতেই বসেছেন। আসলে সুস্থ ও সমৃদ্ধ পরিবার একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ ও সভ্যতার জন্ম দেয়। অন্যদিকে, পারিবারিক বিপর্যয় সভ্যতা ধ্বংসের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক জীবনে অনাবিল শান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে পারিবার হয়ে ওঠে সব উদ্যম, প্রেরণা ও প্রশান্তির ক্ষেত্র। তেমন একটি পরিবারই সমাজকে ইতিবাচক অর্থে সার্থকভাবে কিছু

দিতে পারে, যা সুস্থ সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। পরিবার প্রথার বন্ধনকে আঁকড়ে ধরে রাখা না হলে পাশ্চাত্যের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরিবার প্রথায় বিপর্যয় নেমে এলে সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটবে। জার্মানির বিখ্যাত লেখক ও রাজনীতিবিদ কার্ল স্লাইডার পাশ্চাত্যের পারিবারবিষয়ক আইনের সমালোচনা করে বলেছেন, প্রচলিত আইন পরিবার নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাঁর মতে, পরিবার হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। কিন্তু তারপরও পাশ্চাত্যে পরিবার প্রথাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। পশ্চিমা বিশেজ্ঞরা আরো বলেছেন, মানুষের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

কিন্তু সব জেনেও পাশ্চাত্যের মানুষ নিজোই নিজের অপূরণীয় ক্ষতি করছে। পরিবারের সদস্যরা তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বর পালন করতে পারছে না। একজন পুরুষও পরিবারের প্রধান হিসেবে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না। বাবা-মায়েরা নিজেদের বিনোদন ও স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। সন্তান লালন-পালন তথা পরিবার ব্যবস্থাপনা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। পাশ্চাত্যের পরিবারগুলোর এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীই ওই সমাজের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় বয়ে আনছে। সন্তানরা তাদের মা-বাবার কাছ থেকে, আচার-আচারণ ও শ্রদ্ধাবোধ রপ্ত করে। এ কারণে সন্তানদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতে হলে নিজেদেরও সদাচারী হতে হবে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে অন্যদের সম্মান দেখতে হবে। যে পরিবারের সন্তানরা মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করে না। সেই পরিবারে প্রকৃত সুখ আসে না।

মার্কিন লেখক পেট্রিক জে, বুকানানের মতে, পশ্চিমা সমাজে গর্ভপাত, তালাক ও আত্মহত্যা বেড়ে গেছে। পাশাপাশি সন্তান লাভে আগ্রহ হারাচ্ছে। মাদকসেবীর সংখ্যাও দিন দিনই বাড়ছে। নারী ও বয়স্কদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া অবাধ যৌনাচার বেড়ে গেছে। আর এ সবাই প্রমান করে পশ্চিমা সভ্যতা ক্ষয়িষ্ণু। মার্কিন এই লেখক পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবকে হেরোইনের ভয়াবহ প্রভাবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হেরোইন যেমন প্রথমে মানুষকে দৃশ্যত প্রশান্তি দিলেও ক্রমেই মানবদেহকে বিকল করে দিয়ে মাদাকসেবীকে মৃত্যু দিকে ঠেলে দেয়, তেমনি পশ্চিমা সভ্যতাও ব্যহত আকর্ষণীয় হলেও এর চুড়ান্ত ফল বিষময়। এ সয়কট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন। ি

ইসলমিক দৃষ্টিতে সুষ্ট ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব "আমার এই রিসার্চে ইসলামী পরিবারের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, ভিত্তি, বিকাশ, আদর্শ পরিবারের বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার তাগিদ। বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশনা, পারিবারিক সম্পর্ক, নারী ও পুরুষের উভয়ের সমাজ গঠনে ভূমিকা, মায়ের অবদান, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমাজ ব্যবস্থা, পরিবার, পরিবারের প্রকার ভেদ, বৈশিষ্ট, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা নারীরদের প্রাতি সহিংসতা, পাশ্চাত্য নারী এবং ইসলামিক নারী তুলনা প্রভৃতি আলোচনা করা শতভাগ চেষ্টা করা হয়েছে।

অবশেষে বলাবাহুল্য যে, ইসলাম সমাজের মৌলিক একক হিসেবে পরিবারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। ইসলামে একটি আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতার একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রয়োজন, সেইসাথে নিজ নিজ ভূমিকা ও বাধ্যবাধকতা পূরণের প্রয়োজন। পিতামাতাকেও তাদের সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে ও ইসলামের মূল্যবোধের সাথে লালন-পালন করে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। যদিও প্রতিদ্বন্দ্বীতাগুলি দেখা দিতে পারে, পরিবারগুলি আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশনা চাওয়ার মাধ্যমে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামিক নীতিগুলি প্রয়োগ করার মাধ্যমে সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে। ইসলামে একটি আদর্শ পরিবারের কাঠামো অনুসরণ করে, পরিবারগুলি একটি শক্তিশালী এবং উত্তম পরিকাঠামো তৈরি করতে পারে যা কেবল নিজেদেরই নয়, বৃহত্তর সম্প্রদায়ের জন্য ও উপকৃত হবে।

তথ্যসূত্র

- https://www.kalerkantho.com/print-edition/dhormo/2014/11/28/156197
- https://www.deshrupantor.com/amp/437364/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC
- https://www.kalerkantho.com/print-edition/dhormo/2014/11/28/156197
- https://wikioiki.com
- https://wikioiki.com

- https://www.bishleshon.com
- https://tawheederdak.com
- https://ittefaq.com.bd
- https://ittefaq.com.bd
- https://prothomalo.com
- https://www.ebookbou.bd
- কালের কণ্ঠ
- www.parstoday.ir
- https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9495
- www.bn.m.wikipedia.org
- পার্সপটুডে/এমআরএইচ/৫
- www.almodina.com
- https://www.rokomari.com
- www.bijlibery.com
- www.dailysangram.com
- www.islammonwed.net
- www.dailysomoyersomikoron.com
- www.kalerkantho.com
- www.ourislam24.com
- www.banglarunnoyon.net.1
- https://www.kalerkantho.com/print-edition/dhormo/2014/11/28/156197
- https://www.ittefaq.com.bd
- আবু শরীফ মাহমুদ খান (১৩ই মে ২০১১, দুপুর ১.১১)

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110719175